উপন্যাস

# শিউলির গন্ধ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

# সূচিপত্র

২. অভিজিৎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
৩. পারিজাত . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
৪. অভিজিৎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
৫. পারিজাত . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
৬. অভিজিৎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
৭. পারিজাত . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
৮. অভিজিৎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
৯. পারিজাত . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

## ১. পারিজাত

হে দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, তোমরা আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার একান্ত আপনার জন্য। আমি তোমাদেরই লোক। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতাম তখন যেমন, এখন দারিদ্র্যসীমার কিছু ওপরে বাস করার সময়েও তেমনই আমি তোমাদেরই লোক হয়ে গেছি। দারিদ্র্যসীমা হল একটা রেললাইনের মতো। মাঝখানে উঁচু রেলবাঁধ, তার দুধারেই লোকালয়। ওধারে তোমরা, এধারে আমরা। তবু আমি সেই রেলবাঁধ পেরিয়ে মাঝে-মাঝেই গিয়ে দেখে আসি ওপারের ভারতবর্ষকে। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষই তো আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, কৈশোরের চারণভূমি, যৌবনের উপবন। দারিদ্র্যসীমা বা রেলের ওই বাঁধটা এমন কিছু পাকাঁপোক্ত বাধাও নয়। এ ধারের লোক প্রায়ই ওধারে যায়, ও ধারের লোক আসে এধারে। কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষে এখনও আমার বিস্তর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু রয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ ঠিক কয় ভাগে বিভক্ত তা আমি জানি না। তবে গুণেনবাবু জানেন। তিনি এ বিষয়ে যে গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করছেন তা শিগগিরই থিসিস হিসেবে পাঠাবেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে ধর্ম, অর্থনীতি ও ভাষার দিক দিয়ে অন্তত চোদ্দোটি ভাগ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, বেসরকারি ভাবে সেই ভাগ হয়েও গেছে, শুধু সরকারিভাবে তা স্বীকার করা হয় না।

স্বীকার আমিও করি না। আমার রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি মনে পড়ে। ওই যে কবিতাটি যার মধ্যে আছে এক দেহে হল লীন। আমার ছাই কিছুই ভাল মনে থাকে না। তবু আমি এক দেহে লীন হওয়ার তত্ত্বটা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু তা নিয়ে গুণেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করতেও আমি যাই না।

তার সব কথা মেনে নিই বলে গুণেনবাবু যে খুশি হন তা মোটেই নয়। উনি সর্বদাই কিছু-না-কিছু নিয়ে তর্ক এবং তাতে জয়লাভ করতে ভালবাসেন। বলতে কী এইটেই ওঁর হবি।

সারাদিন উনি প্রতিপক্ষ খোঁজেন এবং যে কোনও লোকের সঙ্গেই যে কোনও বিষয়ে একটা তর্ক বাধানোর চেষ্টা করেন। ওঁর ভিতরে তর্কের বিষদাত সর্বদাই শুলশুল করে। গুণেনবাবুর সঙ্গে আমার তর্ক না করার আর একটা কারণ হল, তার বোন অসীমার সঙ্গে আমার বিয়ের একটা কথা চলছে। অসীমা রোগা, কালো এবং অসুন্দরী হলে কী হয়, সে একটা ভাল জাতের কো-এডুকেশন স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস, ডবল এম এ এবং বি এড-এ ফার্স্ট ক্লাস।

.

অসীমা একদিন আমার ঘরে একখানা বই ফেলে যায়। ইস্কুলের পাঠ্য বাংলা বই। তাতে আমি রবীন্দ্রনাথের সেই এক দেহে হল লীন কবিতাটি পেয়ে যাই। সেইদিনই গুণেনবাবুকে কবিতাটি শুনিয়ে বে-খেয়ালে বলে ফেলেছিলাম আপনি ভারতবর্ষকে যে চোদ্দোটা ভাগে বিভক্ত করেছেন আসলে ইমাজিনেশন।

তর্কের গন্ধ এবং প্রতিপক্ষ পেয়ে গুণেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হল, তিনি খুব ঠান্ডা গলায় শুরু করলেন, ইমাজিনেশন? ইমাজিনেশন? আপনি কি জানেন বিষুবরেখাও ইমাজিনেশন। হায়ার ম্যাথম্যাটিকসও ইমাজিনেশন! আপেক্ষিক তত্ত্বও ইমাজিনেশন! যারা এইসব ইমাজিন করেছে তারা কি ঘাস খায়?

বন্ধুগণ, এই ঘাস খাওয়ার কথায় আমি ভিতরে ভিতরে লজ্জা ও হীনমন্যতায় অধোবদন হয়ে যাই। কারণ আমাকে একবার বাস্তবিকই ঘাস খেতে হয়েছিল। তখন আমি দারিদ্র্যসীমার নীচে, অনেক নীচে বাস করতাম। আমার বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য স্ট্যাম্প ভেন্ডর। তার ওপর দুরন্ত এক হাঁপানি রোগে এমন কাহিল যে বছরের ছমাস বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। সেবার ভারী বর্ষায় আমাদের এলাকাটা বানে ভাসছে। জলে ভিজে আমরা স্যাঁতা ও সাদা হয়ে গেছি। টানা তিন দিন আমাদের ভদ্রগোছের কোনও খাওয়া জোটেনি। একদিন মা আমাদের গমের সঙ্গে মিহি করে কুচোনো ঘাস ও অন্যান্য লতাপাতা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে দেয়। খুব আনন্দের সঙ্গে না

হলেও আমরা ভাইবোনেরা তা বেশ পেট ভরেই খেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঘাস খাওয়ার ফলে আমার মগজ তৃণভোজীদের মতো হয়ে গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ঘাস খাওয়ার সেই স্মৃতি আমাকে এতটাই অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ করে তুলল যে, গুণেনবাবুর যাবতীয় যুক্তিতর্কে আমি কেবল হুঁ দিয়ে গেলাম। উনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন।

আমার প্রতিবেশী জহরবাবু প্রায়ই বলেন, আপনার অতীতের সেইসব সাফারিংস নিয়ে একটা বই লিখুন না। এসব লোকের জানা দরকার। ইস্কুলেও পাঠ্য হতে পারে।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। জীবনী লেখার মতো বয়স বা সফলতা আমি এখনও অর্জন করিনি। তবু জহরবাবু কেন আমাকে জীবনী লেখার কথা বলেন তা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। উনি জানেন, নিজের অতীত জীবনের দারিদ্র্য সম্পর্কে আমার একটা রোমান্টিক ভাবাবেগ আছে। আমি কত কষ্ট করেছি সেটা লোককে আমি জানাতে ভালবাসি। দ্বিতীয় আর একটা কারণ হল, আমি ইচ্ছে করলে ওঁর মেজো মেয়ের একটা চাকরি অসীমাদের স্কুলে করে দিতে পারি। কারণ আমি ওই স্কুলের সেক্রেটারি।

জহরবাবু তাই আমার কাছে যাতায়াত বজায় রাখেন। কিন্তু মুশকিল হল জহরবাবু যথেষ্ট কথা জানেন না, বেশিক্ষণ বাক্যালাপ চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর এবং তেল দেওয়ার সঠিক পদ্ধতিও তিনি শেখেননি। তবু আমাকে ভিজিয়ে রাখার জন্য তিনি আমার কাছেই আমাকে একজন মহৎ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করা চেষ্টা করে যান। তাঁর মতে দরিদ্র অবস্থা থেকে আমার এই উন্নতি যুদ্ধজয়ের মতো। আজকালকার যুগে এরকমটা নাকি দেখা যায় না।

.

কেন দেখা যায় না? আমি একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

বলাবাহুল্য জহরবাবু জবাবটা খুঁজে পাননি।

কিন্তু গুণেনবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন, জহরবাবু ঠিকই বলেছেন। আজকালকার যুগে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে কেউই কোটিপতি হতে পারে না। এখানকার অরগানাইজড ক্যাপিট্যাল এমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছে যে, আগের দিনের মতো পঞ্চাশ টাকার ক্যাপিট্যাল নিয়ে ব্যাবসা শুরু করে নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের গুণে পাঁচ কোটি টাকার মালিক হওয়া এখন অসম্ভব। ছোট ব্যবসায়ীদের উন্নতিরও একটা অদৃশ্য এবং অঘোষিত সিলিং আছে। তার ওপরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চ্যানেলেই রোড ব্লক আছে।

জহরবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, সেইজন্যই বলছিলাম, পারিজাতবাবু অসামান্য লোক। এই অরগানাইজড ক্যাপিট্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে উনি সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় হতে পেরেছেন। এ যুগে দেখা যায় না।

গুণেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, পারিজাতের কথা আলাদা। ওকে কখনও অরগানাইজড ক্যাপিটালকে ফেস করতে হয়নি। ও এমন কিছু বড়ও হয়নি।

গুণেনবাবু অবশ্য তার মন্তব্যটিকে আর ব্যাখ্যা করলেন না। বরং হবু ভগ্নিপতি সম্পর্কে একটা বেস কথা বলে ফেলার লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলেন।

.

জহরবাবু বোকা-বোকা মুখ করে বসে ছিলেন। আমি বোকা নই। আমার জানা আছে, বাইরে আমার সম্পর্কে নানা ধরনের গুজব জন্ম নেয় এবং বিস্তার লাভ করে।জহরবাবুর কানেও সেইসব গুজব গিয়ে থাকবে। উনি হয়তো সেগুলি বিশ্বাসও করেন। কিন্তু তবু আমাকে একজন মহৎ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা ছাড়া ওঁর আপাতত অন্য উপায় নেই।

আমি ওঁকে আমার দরিদ্র জীবনের একটা গল্প শোনালাম। সে একটা করুণ পায়জামার গল্প। বহুদিন বাদে পুজোর সময় বাবা আমাদের ভাইবোনকে নতুন জামাকাপড় দিলেন একবার। তেমন। কিছুই না। ভাইরা পেলাম খুব মোটা কাপড়ের একটা পায়জামা।

বোনেরা পেল মোটা ছিটকাপড়ের ফ্রক। সে কী আনন্দ আমাদের। পায়জামা দেখি, শুকি, সারাদিন শতেকবার খুলি, আবার ভাজ করে রাখি।

সাদামাটা এই গল্পটা শুনে জহরবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। খুবই কোমল-হৃদয় মানুষ বলতে হবে। ফিসফিস করে বললেন, লিখে ফেলুন, এসব লিখে ফেলুন, একটা মহৎ জীবনীগ্রন্থ হবে।

কিন্তু আমি বুঝি না, দারিদ্র্যের কথা লিখে কী লাভ? দারিদ্র্য জিনিসটা কেমন তা আমার জীবনী পড়েই বা কেন জানতে হবে লোককে? তারা কি জানে না? জহরবাবু নিজেও ভালই জানেন। কারণ ওই দারিদ্র্যসীমার খুব কাছেই ওঁর বাস। মেজো মেয়েটার চাকরি না হলে গ্রাসাচ্ছাদনের খুবই অসুবিধে দেখা দেবে। তবু উনি এমনভাবে আমার কাছে দারিদ্র্যের কথা জানতে চান যেন সেটা কোন দূরের অচেনা রাক্ষসপুরীর গল্প।

অবশ্য জহরবাবুকে দোষ দিই না। আমি নিজেও আমার অতীত দারিদ্র্যের কথা লোকের কাছে গল্প করতে ভালবাসি। জহরবাবুর মতো দু-চারজন লোক তা শোনেন এবং নানারকম সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আমার পুরুষকারেরও প্রশংসা করেন কেউ কেউ।

কিন্তু নিন্দুক এবং রটনাকারীরও অভাব নেই। আমার সম্পর্কে অনেকরকম গল্প ও গুজব প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজবাড়ির আলমারির গল্প।

এক সময় একটা শহরে আমি ছিলাম। সেটা ছিল এক করদ রাজ্যের রাজধানী। ছোটখাটো ছিমছাম শহর। রাজাদের সেই আগেকার রবরবা নেই। ক্রমে ক্রমে অবস্থা পড়তে পড়তে এমন তলানিতে এসে ঠেকল যে, রাজবাড়ি থেকে নানারকম পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দেওয়া হতে লাগল।

.

লোকে বলে, আমি নাকি জলের দরে রাজার একটা পুরনো কাঠের আলমারি কিনে নিই! বহুকাল খোলা হয় না এবং চাবিও বেপাত্তা বলে আলমারির ভিতরে কী আছে তা আর দেখে নেওয়ার সময় বা সুযোগ রাজার হয়নি। সেই বন্ধ আলমারির ভিতর নাকি আমি কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর বাসন পেয়ে যাই। ফলে অরগানাইজড ক্যাপিটালের সমস্ত অবোধ পার হয়ে রাতারাতি পুঁজিপতিদের এলাকায় ঢুকে যেতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি।

বলাবাহুল্য এ গল্প আদপেই সত্য নয়! রাজবাড়ি থেকে একটা বিলিতি ওক কাঠের আলমারি আমি কিনেছিলাম বটে, কিন্তু তার ভিতরে তেমন সাংঘাতিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেকথা আমি বললেই বা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? লোকে বিশ্বাস করে সেটাই যেটা তারা বিশ্বাস করতে চায়। সুতরাং আমার সম্পর্কে প্রচলিত গুজবগুলির প্রতিবাদ আমি কখনও করি না। বরং আমার চারদিকে যে অবাস্তব রহস্যময় একটা কল্পকুহেলি গড়ে উঠেছে সেটাকে আমি গড়ে উঠতে দিচ্ছি।

আজকাল বিকেলের দিকে প্রায়ই অসীমা আমার বাড়িতে আসে। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। অসীমাদের পরিবার খুবই রক্ষণশীল। বিয়ের আগে মেলামেশার ব্যাপারটা তারা আদপেই পছন্দ করে না। কিন্তু সময়টা সেই পুরনো আমলে বসে নেই। সব রীতিনীতি ও মূল্যবোধই পাল্টে গেছে। সুতরাং অসীমা আসে এবং তার বাড়ির লোক দেখি না দেখিনা ভাব করে থাকে।

.

তবে একথাও ঠিক যে, অসীমা আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য মোটেই আসে না। তার আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু সে যখন আসে তার আসাটা আমি রোজ লক্ষ করি।

আমার বাড়ির সামনে অনেকটাই জমি ছাড় দেওয়া আছে। সিংহবাবুরা একসময়ে এই জমিতে খুব সুন্দর বাগান করেছিলেন। কিন্তু সাজানো বাগান আমি ভালবাসি না। বরং

একটা বন্য ধরনের অনিয়মিত এবং অসজ্জিত গাছপালা আমার বেশি পছন্দ। সেইজন্য বাগানে আমি মালি লাগাইনি। যত্রতত্র গাছ গজাচ্ছে এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছে। একটা লাল মোরামের মি পথ ফটক থেকে বাঁকা হয়ে এসেছে বাড়ির সদর পর্যন্ত। এই পথটির দুধারে বেঁটে বেঁটে লিচু আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। চমৎকার ছায়া পড়ে থাকে পথে। লতানে গোলাপগাছও মেলা। খুব ফুল ফোটে। এই চমৎকার পথটি দিয়ে বিকেলের দিকে, প্রায় সন্ধের কাছাকাছি সময়ে ক্লান্ত অসীমা যখন আসতে থাকে তখন তাকে লক্ষ করতে আমার বেশ ভাল লাগে। না, ওই পথ আর ছায়া আর গাছপালার চালচিত্রে অসুন্দরী যে অপরূপ হয়ে ওঠে তা নয়। বরং তাকে আরও রোগা আরও কালো, আরও লাবণ্যহীন দেখায়। খুব রোগা বলেই বোধহয় ইদানীং একটু কুঁজোমতও হয়ে গেছে সে। কড়া মেজাজের দিদিমণি বলে তার মুখচোখেও একটা অতিরিক্ত রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। সে খোঁপা বাঁধে এবং সাদা খোলের শাড়ি পরে। হাতে একটা ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনও গয়না নেই। তার মতে পুরুষরা ডিসিপ্লিন মানে না, বোকার মতো কথা বলে এবং প্রায় সময়েই অসভ্যের মতো আচরণ করে। পুরুষদের প্রতি সেই বিরাগও তার মুখে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এই কুৎসিত, লাবণ্যহীন অসীমাকে তবু আমি লক্ষ করি। খুব লক্ষ করি।

আমি থাকি নীচের তলায় সামনের দিককার ডানহাতি ঘরখানায়। মাঝারি মাপের ঘরখানা মোটামুটি একটা অফিসের ধাচে সাজানো। মাঝখানে একটা বড় ডেস্ক ও চেয়ার, ফাইল ক্যাবিনেট, টাইপরাইটার, টেলিফোন ইত্যাদি। ঘরের এক কোণে একটা লম্বা সরু চৌকিতে বিছানা পাতা থাকে। আমি রাতে প্রায় সময়েই ওই বিছানায় শুই। কারণ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করার পর প্রায়দিনই আমার আর ভিতর বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না।

অসীমা এই ঘরেই এসে আমার মুখোমুখি বসে। ছোট্ট একটা রুমালে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মোছে। প্রথমেই আমরা কথা শুরু করি না। আমার বা অসীমার কারওরই তেমন কোনও প্রগভতা নেই। তাছাড়া কথা বলার অসুবিধেও থাকে। আমার টাইপিস্ট ছেলেটি সন্ধে

সাতটার আগে ছুটি পায় না। বিকেলের দিকে অনেক পার্টিও আসে। সুতরাং অসীমাকে অপেক্ষা করতে হয়।

প্রায়দিনই আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বাগানে বসি। সিংহবাবুদের শখ ছিল। বাগানে তারা চমৎকার কয়েকটা বেঞ্চি বসিয়ে গেছেন। কোনও কোনও বেঞ্চির চারধারে ঘনবদ্ধ কুঞ্জবন। প্রেম করার আদর্শ জায়গা।

আমরা এরকম একটা কুঞ্জবনেই গিয়ে বসি। খুব সাদামাটা ভাবেই আমাদের কথা শুরু হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, অডিটে আর কোনও কিছু রা পড়ল?

হ্যাঁ। ফারনিচার অ্যাকাউন্ট, বুক পারচেজ, রিনোভেশন সবটাতেই গণ্ডগোল।

ইস্কুলে নিশ্চয়ই বেশ উত্তেজনা!

হ্যাঁ।

কী রিঅ্যাকশন দেখলে?

খুব ডিসটার্ব বোধ করছে সবাই।

আমি একটুও চিন্তিত হই না। বলি, আর কী খবর?

কমলাদি খুব ডেসপারেট হয়ে উঠছে।

কীরকম?

অধরবাবু আজ স্কুলে এসেছিলেন।

বলো কী? দিনের বেলায়?

তাই তো দেখলাম। কী বিশ্রী ব্যাপার বলল তো!

কেন এসেছিল?

নিজে থেকে আসেনি। দপ্তরির কাছে শুনলাম কমলাদিই নাকি তাকে চিরকুট দিয়ে অধরবাবুর কাছে পাঠিয়েছিল।

কেন, তা জানতে পারোনি?

না, তবে সেকেন্ড পিরিয়ড থেকে যোর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত অধরবাবু কমলাদির চেম্বারে ছিলেন। বাধহয় গারজিয়ানস মিটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আমি একটু ভাবলাম। কমলা সেন অসীমাদের হেডমিসট্রেস। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স এবং এখনও কুমারী। অধরবাবু এই শহরের মোটামুটি নামকরা একজন ঠিকাদার। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিবাহিত এবং চার-পাঁচটি ছেলেপুলের বাবা। এঁদের দুজনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক বহুকাল ধরে চালু আছে বলে গুজব। তবে সম্পর্কটা দেহগত না শুধুই ভাবগত সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়। কমলা কেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, তার আমলে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রেজাল্টও দারুণ। কাজেই তার সম্পর্কে অপপ্রচার যা-ই থাক সেটা তেমন গুরুত্ব পায় না। অপরপক্ষে অধরবাবু অত্যন্ত ডাকাবুকো লোক। শোনা যায় তিনিও দারিদ্র্যসীমার তলা থেকে উঠে এসেছেন। একসময়ে ভাল খেলোয়াড় এবং দুর্দান্ত গুন্ডা ছিলেন। তার একটা বেশ বড়সড় দল আছে। অধরবাবুর দানধ্যান এবং পরোপকারেরও যথেষ্ট সুনাম। কমলা সেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে রকমই হোক সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার মতো লোকবল ও অর্থবলের অভাব তার নেই।

কিন্তু এরকম একটা অনৈতিক ব্যাপারকে চলতে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করিনি। জনসাধারণের ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা তাদের গোচরে আনতে আমি প্রথমে শহরে কয়েকটা পোস্টার দিই। তাতে একটু গুঞ্জন উঠলে পরে অভিভাবকদের একটা মিটিং ধারণ

করে। অভিভাবকদের মিটিং-এ দুজন রাজনৈতিক নেতাও ভাষণ দেন। বিস্ময়ের কথা হল, কমলা সেন তার বিরুদ্ধে রটনাটাকে অস্বীকার করেননি। স্বীকারও করেননি। অর্থাৎ তিনি মুখ খুলতে চাননি।

আমি বললাম, নজর রেখো।

রাখছি। তবে, কমলাদি খুব রেগে আছেন।

তাই নাকি?

অসীমা একটা ক্লান্তির বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার সঙ্গে আজ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

কেন?

আমি অডিটারদের কাছে রোজ যাই এবং কথা বলি বলে।

তাতে দোষ কী?

দোষ তো নেই-ই। কিন্তু উনি ঝগড়া করার একটা পয়েন্ট খুঁজছিলেন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কিছু বললে ছেড়ে দিয়ো না।

আমি উচিত কথা বলতে ছাড়ি না।

খুব ভাল।আমি উদার গলায় বলি।

অসীমা একটু চুপ করে থেকে সামান্য বুঝিবা বিষণ্ণ গলায় বলল, কিন্তু আমি কমলাদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করায় কলিগরা কেউ খুশি হয়নি।

না হওয়ারই কথা। কমলা সেন সম্পর্কে প্রচার যাই থাকুক, উনি অসম্ভব জনপ্রিয়। সহকর্মীরা ওঁকে বড় বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সুতরাং অসীমা উচিত কথা বললেও সেটা ওদের কাছে অনুচিত শোনাবে। তাই আমি অসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুশি হয়নি কী করে বুঝলে?

সবাই অ্যাভয়েড করছিল আমাকে।

আমি কুঞ্জবনের আলো-আঁধার অসীমার শুষ্ক রুক্ষ মুখখানা লক্ষ করছিলাম। বোধহয় সুন্দরের মতো কুৎসিতের মধ্যেও একধরনের আকর্ষণ আছে। আসলে হয়তো সেটা বিকর্ষণই। জটিল এক মানসিক প্রক্রিয়ায় সেইটেই আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি অসীমার মধ্যে সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যের অভাব লক্ষ করছিলাম না। আমি বরং ওর মুখে অতি সম্প্রতি যে গভীর ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তার কারণটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম।

অসীমা তার স্কুলটিকে বোধহয় ভালবাসে। খুব গভীরভাবেই বাসে। এই স্কুলে কোনও কারচুপি বা হিসেবের গোলমাল ধরা পড়লে সে নিশ্চয়ই খুশি হয় না। কিন্তু তার কিছু করারও নেই। সম্ভবত খুব শিগগিরই সে এই স্কুলের হেডমিসট্রেস হবে। এবং তা হবে কমলা সেনকে সরিয়েই। একসময়ে কমলা সেন সম্পর্কে অসীমার অন্ধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আজ নেই। এই সবের মূলে হয়তো আমার অবদানের কথাই সে ভাবে। আর তাই তার ক্লান্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অসীমাও তা জানে। তাই জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে শুধু বলল, স্কুলে আমি খুব আনপপুলার হয়ে গেছি।

কেন, ছাত্রছাত্রীরাও কি তোমাকে অপছন্দ করে?

তাই তো মনে হয়।

কেউ ওদের উসকে দিচ্ছে না তো?

কী করে বলব?

খোঁজ নাও। যদি দেখো দিচ্ছে তাহলে আমাকে জানিয়ো।

অসীমা খুব করুণ বোবা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। সে দৃষ্টির ভাষা আমি পড়তে পারলাম না। তবু মনে হল, অসীমার চোখ আমাকে বলছে, ক্ষ্যামা দাও, আর আমার ভাল তোমাকে করতে হবে না।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে অসীমা কেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। তবে সে কোনওকালেই ওদের তেমন প্রিয় দিদিমণি ছিল না। সবাই তাকে ভয় করত এবং মেনে চলত, এই যা।

আকাশ মেঘলা করেছে। কুঞ্জবন আঁধার হয়ে এল। আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, চলো, উঠি।

চলো।

এইভাবেই রোজ আমাদের প্রেমপর্ব শেষ হয়। আমরা উঠে পড়ি এবং যে যার কাজে চলে যাই। অসীমা সম্ভবত এইরকম উত্তাপহীন প্রেমই পছন্দ করে। সে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করছে। ফলে তার একটা কঠোর নীতিবোধ জন্ম নিয়েছে। তাকে স্পর্শ করলে বা আরও ঘনিষ্ঠ কিছু করতে গেলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করবে। আমি জানি বিয়ের পরেও এই সংকোচ কাটাতে তার সময় নেবে। আমারও তাড়া নেই। অসীমাই তো আমার জীবনে প্রথম মহিলা নয়। এমনকী সে আমার প্রথম স্ত্রীও হবে না।

এর আগে আমি আর একবার বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সেই স্ত্রী মণিমালা আত্মহত্যা করে।

# ২. অভিজিৎ

বেশিদিন বেঁচে থাকলে মানুষকে ভারী একা হয়ে যেতে হয়। সমান বয়সের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদিবা খুঁজে পাওয়া যায় তো যোগাযোগ হয় না।

আমার দাদুকে দেখে সেইটে খুব স্পষ্টভাবে বুঝলাম আমি।

আমার ঠাকুমা অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে দাদুকে সঙ্গ দিয়ে গেছেন। তবু শেষ অবধি বয়সের কমপিটিশনে তিনি পেরে ওঠেননি। বছর পাঁচ-ছয় আগে আশি বছর পার হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। দাদু নব্বই পেরিয়েছেন। খুব বহাল তবিয়তে আছেন বলা যায় না কিন্তু আছেন।

আমাদের বাড়িটা খুবই খাঁ খাঁ করে আজকাল! বাসযোগ্য দুখানা ঘর আছে। পাকা ভিত, ইটের দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। আর উঠোনের দুদিকে আর-দুটো মাটির ঘর। ঠিকমতো লেপা পোঁছা এবং মেরামতি না হলে মাটির ঘর টিকিয়ে রাখা যায় না। এখানে-সেখানে খোঁদল দেখা দেয়, মেঝেয় বড় বড় গর্ত হতে থাকে, রোদে জলে ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণের ফলে ফাটল ধরে। আমাদের মেটে ঘর দুখানার দুর্দশা চোখে দেখলে কষ্ট হয়। ওরই একখানা ঘরে আমি চব্বিশ বছর আগে ভূমিষ্ঠ হই।

পাকা ঘর দুখানা নিয়ে দাদুর বাস। যত রাজ্যের বাজে জিনিসে ঘরদুটো ঠাসা। পুরনো কৌটো, শিশি, খবরের কাগজ, ভাঙা একখানা সাইকেল, কিছু ঘুণে ধরা তক্তা, অকাজের বাঁশের খুঁটি। দাদু কিছুই ফেলে দেননি। বরাবরই তার সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক। তবু সঞ্চয়ের মতো বাড়তি কিছুই তিনি হাতের কাছে পাননি কোনওদিন। যা পেরেছেন রেখেছেন। বাড়িতে মোট এগারোটা নারকোল গাছে সারা বছর অফুরন্ত ফলন। কে খাবে? দাদু নারকোল বেচে দেন। বাঁধা লোক আছে। সে এসে নারকোল ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ছোবড়াগুলো দাদু বস্তা-বোঝাই করে সঞ্চয়ের ঘরে তুলে রাখেন। তার খুব ইচ্ছে রেলে

বোঝাই করে আমরা ছোবড়াগুলো কলকাতায় নিয়ে যাই। নারকেলের ছোবড়া নিশ্চয়ই গৃহস্থের কোনও-না-কোনও কাজে লাগে। এ বাড়িতেই একসময়ে ছোবড়ার কত কদর ছিল। গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হত, সন্ধেবেলায় ধূপ জ্বালানো হত, দড়িদড়াও তৈরি হয়েছে একসময়ে। ওই একই মানসিকতার দরুন দাদু গত ত্রিশ বছর ধরে তার যাবতীয় পুরনো জুতো জমিয়ে রেখেছেন। অব্যবহার্য রকমের ঘেঁড়া, বেঁকে যাওয়া সেইসব জুতো কোনওদিনই কারও কাজে আসবে না। তবু আছে।

স্মৃতি তার সঙ্গে বড় লুকোচুরি খেলে আজকাল। সেও এই বয়সেরই গুণে। আর যেটা হয়, কেমন যেন আপনজনদের প্রতি ঠিক আগেকার মতো বুকছেঁড়া টান ভালবাসা থাকে না। বয়সের ইঁদুর এসে মায়ামোহের সুতোগুলো কুটকুট করে কেটে দিয়ে যায়। গাঁয়ের বাড়িতে দাদু এখন একা। নির্ভেজাল একা। তবু তার কোনও হাহাকার নেই। ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের কেউ এলে খুব যে খুশি হন তা নয়। এলে আসুক। গেলে যাক।

এক মাঝবয়সি মেয়েছেলে আসে রোজ। ঝটপাট দেয়। বিছানা তোলে, পেচ্ছাপের কৌটো ধুয়ে দেয়। সে-ই রান্না করে দিয়ে যায় একবেলা। দুপুরে তার যুবতী মেয়ে এসে বাসন মাজে। সন্ধেবেলা দাদু নিজেই উঠোনে কাঠকুটো জ্বেলে দুধ গরম করে নেন। খই দুধ খেয়ে শুয়ে থাকেন। বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এইভাবে।

নকশাল আন্দোলনের সময় আমাকে একবার পালিয়ে আসতে হয়েছিল দাদুর কাছে। তখন থেকেই আমি তাঁর জীবনযাপনের ধারাটা ভাল করে জানতে থাকি।

সেবার আমাকে দাদুর কাছে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ঠাকুমা তখনও বেঁচে ছিলেন। অনেকদিন আমি কলকাতায় ফিরছি না দেখে দাদু আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। আমি পরীক্ষায় ফেল করিনি তো? কোনও মেয়ের সঙ্গে লটঘট করে আসিনি তো? ঠাকুমা ধমক দিতেন, নাতিটা এসেছে, অত খতেন কীসের?

আমি দাদুকে আন্দোলনের সোজা কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কেন আন্দোলনটা হচ্ছে বা কেন হওয়া দরকার। দাদু সেসব বোঝেননি। আসলে সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে তিনি আর ওতপ্রোত জড়িত নন। কোথায় একটা পার্থক্য ঘটেই গেছে। যেন জেটির থেকে তফাত হওয়া স্টিমার। দেশ কাল আত্মীয়তা সময় সবই এক অস্পষ্টতায় মাখা।

যদিও এই বাড়িতেই আমার জন্ম এবং এই গ্রামটাই আমার জন্মভূমি, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা আমাদের দেশ নয়। এই বাড়ি ছিল গণি মিয়ার। আমরা ঢাকা জেলার লোক। দেশভাগের পর আমাদের ঢাকার গাঁয়ের বাড়ির সঙ্গে গণি মিয়ার এই বাড়ি দাদু বদল করে নেন। পাড়াগাঁয়ে বসতি স্থাপনে দাদুর ছেলেমেয়েদের আপত্তি ছিল। কিন্তু দাদু শহরে যেতে চাননি। ভূমি এবং আশ্রয়ের সংজ্ঞা তার কাছে আলাদা। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এটা তোমাদের দেশের বাড়ি হিসেবে রইল। তোমরা পালে-পার্বণে আসবে।

সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল কি না বলতে পারি না। ছেলেমেয়েরা একে একে বড় হল এবং একে একে চলে গেল। পালে-পার্বণেও বড় একটা কেউ আসে না। দাদু আজ একা বটে, কিন্তু খুব অসুখী তো নন।

জায়গাটা গ্রামের মতো হলেও শহর থেকে খুব দূরে নয়। শহরের স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মাত্র দুমাইলের মতো বাসে বা রিকশায় আসতে হয়। তারপর কিছুটা হাঁটাপথ। রাস্তাটা যে খুব ক্লান্তিকর তা নয়। অন্তত বছরে এক-আধবার আসতে খারাপ লাগে না। শহরের ভিড়ভাট্টা ছেড়ে প্রকৃতির নির্জনতায় পা দিলে, খারাপ লাগবেই বা কেন?

তবে প্রকৃতি ক্রমে নিকেশ হয়ে আসছে। বাস যেখানে থামে সেই বড় রাস্তায় আগে দোকানপাট তেমন ছিল না। আজকাল হয়েছে। এক-আধটা নয়। সারি সারি বেড়া আর টিনের ঘরে হরেক পসরা। বসতিও বাড়ছে। নির্জনতা সরে যাচ্ছে। গ্রামকে ত্রাণ করতে এগিয়ে আসছে শহরের থাবা। হাঁটা পথটুকু আগে এত নির্জন ছিল যে, দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত। এখন কঁচা রাস্তাটা পাকা হয়েছে। পাকা বাড়ি উঠেছে কয়েকটা। একটা

ইস্কুল এবং দুটো সরকারি দফতর বসে গেছে। সুতরাং পুরনো দিনের তুলনায় বেশ জমজমাট অবস্থা বলতে হবে।

আমাদের কিছু চাষের জমি ছিল। নতুন ধান উঠলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। কিন্তু ক্রমে ফসলের খেত নিয়ে বড় গণ্ডগোল দেখা দেয়। ধানকাটা নিয়ে মারপিট, জোর করে ফসল কাটা বা চুরি এমন একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল যা দাদুর পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। কাজেই উনি জমি বেচে দিলেন। মোট তিন বিঘা জমি নিয়ে আমাদের বাড়ি। এখন ওই তিন বিঘাই সম্বল। কিছু মরশুমি সবজির চাষ হয় মাত্র। শুনতে পাচ্ছি আমাদের ওই তিন বিঘা জমি কেনার জন্যও লোক ঘোরাঘুরি করছে। শহর খুব এগিয়ে আসছে।

আমি পৌঁছলাম ঠিক দুপুরবেলা। তখন দাদুর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশের নীচে একটা গাঢ় ছায়া পড়ে আছে চারধারে। হাওয়া নেই। এখানে-সেখানে জল জমে আছে। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকবার পথটায় ভীষণ কাদা। জোড়া জোড়া ইট পাতা হয়েছিল সেই কবে। আজও বর্ষায় বাড়ি ঢুকতে সেই পুরনো ইটে পা ফেলে যেতে হয়। সাবধানে ইটের ওপর পা ফেলে টাল সামলাতে সামলাতে বাড়িতে ঢুকবার সময় দেখলাম দাদু সামনের দাওয়ায় কাঠের চেয়ারটায় বসে খুব সন্দিহান চোখে আমাকে দেখছেন।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, খেয়ে এসেছ তো?

তার উদ্বেগের কারণটা বুঝি। রান্নার লোক চলে গেছে। বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই যে বেঁধে দেবে। এ সময়ে উটকো লোক এলে তার ঝামেলা।

বললাম, পারুলদের বাড়িতে খেয়ে নেব।

নিশ্চিন্ত হয়ে মুখের হরতুকিটা এ গাল থেকে ও গালে নিলেন। কারও কথা জিজ্ঞেস করলেন না, কলকাতার খবর জানতে চাইলেন না। যেনবা সেসবের আর প্রয়োজন নেই। তিনি নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার থাকতে চান। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, কদিন থাকবে?

আমি বললাম, দেখি।

কুয়োর জলে অঢেল স্নান করে আমি পারুলদের বাড়ি খেতে গেলাম।

আগে থেকে খবর দেওয়ার কোনও দরকার হয় না পারুলদের বাড়িতে। কিছু মুখ ফুটে বলতেও হয় না। অসময়ে গিয়ে হাজির হলেই আপনা থেকেই সব টরেটক্কা হয়ে যায়।

বলাই বাহুল্য পারুল আমার বাল্যসখী এবং প্রেমিকা। আমার বাল্যকাল তো বেশি দূরে ফেলে আসিনি। আমার বয়স মাত্র চব্বিশ। পারুলেরও ওরকমই।

প্রেম কীরকম তা আমি জানি না। পারুলের সঙ্গে আমার সত্যিই প্রেম ছিল কি না তা আজ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। অনেক তর্ক, অনেক বিচার এসে পড়ে। আমি তেমনভাবে কোনওদিন ওর অঙ্গ স্পর্শ করিনি, চুমু খাইনি, ভালবাসার একটি কথাও বলিনি! ইচ্ছেও হয়নি কখনও। তবে প্রেম বলি কী করে? যখন ওর বিয়ে হয়ে যায় তখন খুব ফাঁকা ঠেকেছিল কয়েকদিন। শুধু সেটুকুই কি প্রেম?

প্রথম কবে দুজনের দেখা তা বলতে পারব না। বোধহয় তখন দুজনেই হামা দিই, বিছানায় হিসি করি এবং পরস্পরের সামনে উদোম হতে লজ্জা বোধ করি না। আমরা এক দঙ্গল ছেলেপুলে ঝক বেঁধে এক সঙ্গে বড় হয়েছি। তার ভিতর থেকে আমি আর পারুল কী করে যে আলাদা দুজন হয়ে উঠি সেও স্পষ্ট মনে নেই। তবে খুব শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল আমাদের সম্পর্ক। আমি ওদের বাড়ি গেলে পারুল খুশি হত, ও এলে আমি। নিঃশব্দে দুটি হৃদয়ের স্রোত পাশাপাশি বইছিল। জল একটু চলকালেই হয়ে যেত একাকার।

স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়েই আমি কলকাতায় দৌড়ালাম। পারুল রয়ে গেল। আমার কাছে আজও পারুলের বিস্তর চিঠি জমে আছে। ভুল বানান, খারাপ হাতের লেখা, তবু নিজের হৃদয়কে সে প্রকাশ করত ঠিকই। লিখত কলকাতা বুঝি খুব ভাল? আর আমি খারাপ? যেন কলকাতার সঙ্গেই ছিল তার অসম লড়াই।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর তার শ্রাদ্ধে যখন আমরা আসি তখনই শেষবারের মতো কুমারী পারুলের সঙ্গে দেখা।

একদিন আমতলায় খড়ের গাদির পিছনে নিরিবিলি কথা হল।

পারুল বলল, আমি তোমার ওপর রাগ করেছি।

কেন?

করেছি ইচ্ছে হয়েছে। আসতে চাও না কেন এখানে?

এখানে এসে কী হবে? আমি পড়ছি যে কলকাতায়।

আর কত পড়বে?

অনেক পড়া।

আমি বুঝি কেবল হাঁ করে বসে থাকব?

আমি কী করব বলল তো?

এত লম্বা হয়েছ কেন? তোমাকে চেনাই যায় না।

লম্বা হওয়ারই তো কথা।

তা বলে এতটা ভাল নয়। ভীষণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

মানুষ তো বয়স হলে বদলে যায়।

আমি বদলেছি?

খুব।

কীরকম বদলেছি?

তুমিও লম্বা হয়েছ।

সুন্দর হইনি তো?

বাঃ, তুমি তো দেখতে ভালই।

তোমার চেহারাটা খুব চালাক-চালাক হয়ে গেছে কেন বলো তো!

তবে কি বোকা-বোকা হওয়ার কথা ছিল?

তা নয়। বলে একটু লজ্জা পেল পারুল। যুবতী বয়সের একটা চটক প্রায় সব মেয়েরই থাকে। পারুলেরও আছে। কিন্তু তা বলে পারুলকে সুন্দর বললে ভুল হবে। যদি কলকাতায় না হয়ে এই গ্রামেই থাকর্তামা তাহলে পারুলকে আরও অনেক বেশি সুন্দর মনে হত। কিন্তু আমি যে শহরে নিত্যদিন বহু সত্যিকারের সুন্দর মেয়ে দেখি।

অবশ্য শুধু সৌন্দর্যটাই কোনও বড় কথা নয়। পারুল বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, ধীর, লাজুক, বুদ্ধিমতী। তার হৃদয়টি নরম। আজকাল মনে হয়, তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখীই হতাম। কিন্তু আমাকে বিয়ের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যদি আদপেই করি। পারুল ততদিন অপেক্ষা করতে পারত না। তার বয়স হয়ে যাচ্ছিল।

তবু আশা করেছিল পারুল। খুব আশা করেছিল। কিন্তু আমি কোনও অসম্ভব প্রস্তাব তো করতে পারি না। আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়। আমার তখন মাত্র

আঠারো-উনিশ বছর বয়স। স্বপ্ন দেখার পক্ষে সুন্দর বয়স, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স সেটা নয়। তার ওপর বর্ণ আলাদা। সেটা নিয়েও কিছু ঝামেলা হতে পারত। শহরে বাস করার ফলে আমার বাস্তব বুদ্ধি কিছু বেড়ে থাকবে।

পারুলদের অবস্থা বেশ ভাল। ওরা জাতে গোপ। বংশগত বৃত্তি ওরা কখনও ছাড়েনি। বাড়ির পিছন দিকে সেই আমতলার ধারেই মস্ত উঠোন ঘিরে টানা গোশালা। অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা গোরু মোষ। দুধ বিক্রি তো আছেই, উপরন্তু শহরের বাজারে এবং রেল স্টেশনে রমরম করে চলছে দুটো মিষ্টির দোকান। আমাদের মতো ওরাও এসেছিল তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। কিছু কষ্টেও পড়েছিল বটে, কিন্তু সামলে গেছে। এখনও ওদের বাড়িতে ঢুকলে সচ্ছলতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মস্ত জমি নিয়ে বসত। অন্তত গোটা তিনেক একতলা এবং দোতলা কোঠাবাড়ি। একান্নবর্তী পরিবার অবশ্য ভাঙছে ভিতরে ভিতরে। তবে বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না।

পারুলের মাকে আমি ফুলমাসি বলে ডাকি। ফরসা গোলগাল আহ্লাদি চেহারা। একটু বেঁটে।

খবর পেয়েই বেরিয়ে এসে বললেন, আয়। কালও তোদের কথা ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলে?

এমনি ভাবছিলাম না। রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম তোর মাকে নিয়ে। শানুদি ভাল আছে তো?

আছে। স্বপ্নের কোনও মানে হয় না কিন্তু।

সে হয়তো হয় না। তবে মনটা কেমন করে যেন।

পারুল কি শ্বশুরবাড়ি?

তাছাড়া আর কোথায়?

বারফট্টাই নেই বলে এদের ঘরে আসবাবপত্র বেশি থাকে না। যা আছে তাও তেমন চেকনাইদার নয়। সাদামাটা সাবেকি খাট, চৌকি, চেয়ার, আলমারি, দেয়াল-আয়না, সস্তা বুক র‍্যাক।

পারুলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দুবাড়ির সকলেই জানত। ফুলমাসির সমর্থনও ছিল। সম্ভাব্য জামাই হিসেবে উনি আমাকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের যত্নআত্তি করতেন। সেই অভ্যাসটা আজও যায়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ বড় রকমের আয়োজন করে ফেললেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম, ফুলমাসি, যাদের ভাল করে খাওয়া জোটে না তাদের ভাল খাইয়ে অভ্যাস খারাপ করে দেওয়াটা খুব অন্যায়।

খুব পাকা হয়েছিস, অ্যাঁ? পেট ভরে খা তো।

পেট ভরে খাব না কেন? আমার তো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তবে ভাল ভাত বা তেঁতুল পান্তা দিলেও পেট ভরেই খেতাম, এত আয়োজন করার দরকার ছিল না।

আচ্ছা, এর পর পান্তাই দেব। এখন খা। তুই নাকি শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে চাকরি পেয়েছিস?

কে বললে?

পারুলের বাবা বলছিল।

গণেশকাকা? গণেশকাকাই তো আমাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে লোক নেবে খবর দিয়ে।

তুই ওর চিঠি পেয়ে এসেছিস? দেখ কাণ্ড! আমাকে বলল অভির চাকরি হয়েই গেছে।

না গো মাসি। শহরে নেমেই আগে স্টেশনের কাছের দোকানটায় গিয়ে গণেশকাকার সঙ্গে দেখা করেছি। শুনলাম দুজন লোক নেবে, অ্যাপলিক্যান্ট ছ'শরও বেশি।

বলিস কী?

গণেশকাকা আমাকে চিঠি লিখে আনিয়ে এখন ভারী অস্বস্তিতে পড়েছেন।

তোর কি তাহলে হবে না?

হওয়ার কথা তো নয়। তবে গণেশকাকা একজনকে মুরুব্বি ধরেছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস। অসীমা না কী যেন নাম।

ও, সেই শুঁটকি! ওকে ধরলে কি কাজ হবে? ওর বরটা বরং করে দিতে পারে।

ও বাবা, আমি অত ধরাধরিতে নেই।

তা সে তুই কেন ধরতে যাবি! যে তোকে আনিয়েছে সেই ধরবে।

শুঁটকির বরটা কে?

ফুলমাসি মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, বর আসলে নয়। বিয়ের কথা চলছে। লোকটা ভাল নয়। আগের বউটাকে গলা টিপে মেরেছে।

তবে তো শাহেনশা লোক।

লোক খারাপ, তবে চাকরিটা করে দিতে পারে।

কলকাতা ছেড়ে আসার ইচ্ছে আমার খুব একটা নেই। সেখানে কর্মহীন দিন আমার অকাজে কাটে বটে, কিন্তু বোজ মনে হয়, চারদিকে এই যে এক অন্তহীন শহর, এত অফিসবাড়ি, এত দোকানপাট, এত ব্যাবসা বাণিজ্য, হয়তো একদিন এ শহর দুম করে একটা সিংহদুয়ার খুলে দেবে সৌভাগ্যের। কলকাতায় কত ভিখিরি রাজা বনে গেছে।

কলকাতায় থাকলে এই সুখস্বপ্নটা দেখতে পারি। কিন্তু মফস্বল শহরে স্বপ্নের কোনও সুযোগ নেই। মনমরা, চোখবোজা হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্মীছাড়া এইসব শহর। এদের রসকষ সব টেনে নিয়েছে কলকাতা। এগুলো শুধু বকলমে শহর। মানুষ আর বসতি বাড়ছে বটে, কিন্তু বাড়ছে না অর্থনীতি। তাই এখানে মাস্টারির চাকরিতে আমার তেমন আগ্রহ নেই। হলে ভাল, না হলে ফের স্বপ্ন দেখার শহরে ফিরে যাব।

আমি তাই ফুলমাসিকে বললাম, অত কিছু করতে হবে না। লোকটাকে নিশ্চয়ই আরও অনেক ক্যান্ডিডেট ধরাধরি করছে। তারা হয়তো স্থানীয় লোক। চাকরি তাদেরই কারও হয়ে যাবে। আমাকে দেবে না। খামোকা এর জন্য একটা বাজে লোককে ধরাধরি করতে গিয়ে গণেশকাকা নিজের প্রেস্টিজ নষ্ট করবেন কে?

বাজে লোক তো ঠিকই। কিন্তু ভাল লোকই বা পাচ্ছিস কোথায়! সব জায়গায় খারাপ লোগুলোই মাথার ওপর বসে আছে।

সেই জন্যই আমাদের হচ্ছে না। হবেও না।

নাই যদি হয় তবে পারুলের বাবাকে আমি খুব বকব। খামোকা তোকে ভরসা দিয়ে টেনে আনল কেন?

সে তো তুমি সবকিছুর জন্যই সবসময়ে গণেশকাকাকে বকো। তোমাদের কোনও গাই এঁড়ে বিয়োলেও নাকি গণেশকাকার দোষ হয়।

ফুলমাসি একটু হেসে করুণ গলায় বললেন, তা আমি আর কাকে বকব? আর কেউ তো আমার বকুনিকে পাত্তা দেয় না।

সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। তাই না? মেয়েদের একটা দোষ কী জানো ফুলমাসি? যত রাগ আর ঝাল ঝাড়বার জন্য তারা স্বামী বেচারাকে ঠিক করে রাখে। আমার মাকেও তো দেখেছি। একবার কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে ঝড় বৃষ্টিতে

মা আটকে পড়েছিল। ফিরতে খুব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হল। বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে নিয়ে পড়ল, সব তোমার দোষ। আমরা তো অবাক। ঝড় বৃষ্টি বাবা নামায়নি, সিনেমাতেও বাবা সঙ্গে যায়নি, তবে বাবার দোষ মা কী করে বের করবে! আমরা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে ঝগড়া শুনতে লাগলাম। আশ্চর্য কী জানো? মা কিন্তু ঠিক মিলিয়ে দিল। গোঁজামিল অবশ্য, কিন্তু ওই ঝড়-বৃষ্টি, দেরি হওয়া সব কিছুর দায়ভাগ বাবার কাঁধে চাপান দিয়েও ছিল। বাবাও তেমন উচ্চবাচ্য করল না।

ফুলমাসি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, আর পুরুষরাই ছেড়ে কথা কয় কিনা। রামকৃষ্ণ ঠাকুর নাকি মাঝে মাঝে ফোঁস করার কথা বলেছেন। তা সেইটে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়ে আজকাল সর্বদাই কেবল ফোঁস ফোঁস করে যাচ্ছেন।

হাসাহাসি দিয়ে খাওয়াটা শেষ হল।

আজকাল হাসি বড় একটা আসতে চায় না। চব্বিশ বছর বয়সেই আমি কি একটু বেশি গোমড়ামুখো হয়ে গেছি?

বাড়ি ফিরতেই দাদু জিজ্ঞেস করলেন, খেলে?

হ্যাঁ।

কী রান্না করেছিল?

ইলিশ মাছ।

দাদুর স্তিমিত চোখ একটু চকচক করে উঠল, ইলিশ ওঠে বুঝি বাজারে?

তা আমি কী করে বলব? ওঠে নিশ্চয়ই, নইলে ওরা পেল কোথা থেকে?

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, এখানকার বাজারে ওঠে না। গণেশ শহর থেকে আনে।

কেন, তুমি খাবে? খেলে বোলো, এনে দেব।

না, এখানকার ইলিশ খেতে মাটি-মাটি লাগে। দেশের ইলিশের মতো স্বাদ না। ইলিশের ডিমভাজা করেছিল নাকি?

না।

ইলিশের ডিমভাজা একটা অপূর্ব জিনিস। মুখের হরতুকিটা এ গাল ও গাল করতে করতে দাদু মনে মনে বহু বছরের পথ উজিয়ে ফিরে যাচ্ছেন দেশে। ভজালী নৌকোর পালে আজ হাওয়া লেগেছে। চোখদুটো কেমন ঘোলাটে, আনমনা।

দুপুরে আমার ঘুম হয় না। পশ্চিমের ঘরের চৌকিতে শুয়ে বুক বরাবর জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলাম।

একটা নারকেল গাছ ঝুপসি মাথা নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। ভারী একা দেখাচ্ছে তাকে। কালো মেঘের একটা ঘনঘোর স্তর থমথমিয়ে উঠছে দিগন্তে। নিজেকে ভারী দুঃখী, ভারী কাতর বলে মনে হয়।

বাইরে একটা সাইকেল এসে থামল। শব্দ পেলাম। দাদুর সঙ্গে কে একজন কথা বলছে। আস্তে বললেও শোনা যাচ্ছিল।

আগন্তুক বলল, কিছু ঠিক করলেন নাকি দাদা?

কী আর ঠিক করব বলো।

পনেরো হাজার নগদ আগাম দিয়ে দিচ্ছি। লেখাপড়া থাকবে। আপনি যতদিন বাঁচবেন এই ঘর দুখানা, উঠোন আর কুয়োতলায় আমরা হাত দেব না। আপনি মরার পর আমরা পুরোটা দখল নেব।

দাদু একটু চটে উঠে বললেন, রোজ এসে আমাকে মরার কথা বলো কেন?

লোকটা বোধহয় একটু থতমত খেয়ে বলে, আজ্ঞে না। মরার কথা ঠিক বলি না। থাকুন না বেঁচে যতদিন খুশি। তবে মরতে তো একদিন সকালেই হবে। তখনকার কথা বলছিলাম আর কী।

তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি মরার জন্য হুড়ো দিচ্ছ।

কী যে বলেন দাদা! এই বয়সেও আপনার চমৎকার স্বাস্থ্য। অনেকদিন বাঁচবেন।

এ জমি নিয়ে তোমরা করবে কী?

আজ্ঞে সে পারিজাতবাবু জানেন। করবেন কিছুমিছু। এক লপ্তে একটু বেশি জমি তো পাওয়া মুশকিল।

দাদু বললেন, আমি শুনেছি এদিকে নাকি সরকারের তরফ থেকে কী সব উন্নতি-টুন্নতি হবে। তাই এখন আর কেউ জমি বেচছে না। দাম বাড়ার আশায় চেপে বসে আছে।

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, সে এদিকে না। রাস্তার ওধারটায় শুনেছি সরকারের কী সব করার প্ল্যান আছে।

দাদু এই বয়সেও কূটনৈতিক বুদ্ধি হারাননি। বললেন, তা ওদিকটা হলে কি আর এদিকটাও বাকি থাকবে?

তা বলতে পারি না। তবে দু-চার হাজার টাকা বেশি দাম দিতে বোধহয় পারিজাতবাবু পিছোবেন না। কিন্তু আপনি তো দরই বলছেন না।

দাঁড়াও, আগে বেচব কি না ভেবে দেখি।

সে তো অনেকদিন ধরে বলছি আপনাকে। একটু ভেবে ঠিক করে ফেলুন।

দাদু বোধহয় হরতুকির টুকরোটাকে আবার অন্য গালে নিলেন। তারপর বললেন, ব্যাপার কী জানো, এ জমিটুকু বেচে দিলে আমার ছেলেগুলো আর নাতি-নাতনিদের আর দেশের বাড়ি বলে কিছু থাকবে না।

সে তো এমনিতেও নেই। তারা সব কলকাতায় বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছে, আর আপনি বুড়ো মানুষ একলাটি পড়ে আছেন এখানে। আপনি চোখ বুজলে তো এখানে ভূতের নেত্য হবে।

দাদু হতাশ গলায় বললেন, না, তুমি দেখছি আমাকে না মেরেই ছাড়বে না। লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, মরার কথা বলিনি, বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চাইছিলাম।

দাদু বললেন, বাস্তব অবস্থাটা আমিও কি আর বুঝি না? এ বাড়িতে আর কেউ না থাক গাছপালাগুলো তো আছে। সেগুলোর মায়াই কি কম! চট করে বেহাত হতে দিই কী করে?

গাছপালায় কেউ হাত দেবে না। যেমন আছে তেমনই থাকবে না হয়।

সে তুমি এখন বলছ। জমি রেজিষ্ট্রি হয়ে গেলেই অন্যরকম। যে টাকা ফেলে জমি কিনছে সে কি আর বুড়ো মানুষের মুখ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? পারিজাত অত ভাল মানুষ নয়।

আচ্ছা, বায়নানামাটা অন্তত করে রাখতে দিন।

তুমি বরং সামনের শুক্কুরবার এসো।

কতবার তো ঘুরে আসতে বললেন। আমিও এসে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি। শুক্রবার কিন্তু দাদা কথা দিতে হবে।

এত তাড়া কীসের বলো তো! একটু রয়ে বয়ে যোক না।

লোকটা বলল, দেরি করলে আবার সব কেটে যাবে যে। জমি আপনার নামে। কিন্তু আপনার অবর্তমানে আপনার তিন ছেলে আর দুই মেয়ে ওয়ারিশান। তখন আবার সকলে এককাট্টা না হলে জমি হস্তান্তর হবে না। ঝামেলাও বিস্তর।

দাদু এবার একটু ঘেঁকিয়ে উঠে বললেন, শুক্কুরবার অবধি আমি বর্তমানই থাকব।

লোকটা শশব্যস্ত বলল, না, না, সে তো ঠিকই। তাহলে ওই পাকা কথা বলে ধরে নিচ্ছি। শুকুরবার না হয় বায়নার টাকাটাও নিয়ে আসব।

আবার সাইকেলের শব্দ পেয়ে আমি ঘাড় উঁচু করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। মুখটা দেখা গেল না। তবে বেশ দশাসই চেহারা।

উঠে দাদুর কাছে এসে বসলাম সামনের বারান্দায়।

লোকটা কেন এসেছিল দাদু? বাড়িটা কি তুমি বেচে দেবে?

দাদু একটু বিব্রতভাবে বললেন, না বেচেই বা কী হবে?

আমার এখানে একটা চাকরি হওয়ার কথা চলছে। যদি হয় তবে আমার ইচ্ছে ছিল এ বাড়িতে থেকেই চাকরি করি।

চাকরি? কীসের চাকরি?

মাস্টারি।

ও বলে দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন, সত্যিই থাকবি নাকি?

যদি চাকরি পাই।

দাদু যেন কথাটায় বেশি ভরসা পেলেন না। বললেন, রোজই লোক আসে। তবে আমি কাউকে কথা দিইনি।

বিকেলে পারুলদের বাড়ি থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিয়ে শহরে রওনা হলাম। আজ বিকেলেই অসীমা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করার কথা। গণেশকাকা নিয়ে যাবেন।

পথে ঝিরঝিরে একটু বৃষ্টি হয়ে গেল! ভিজলাম। আকাশ জমাট মেঘে থম ধরে আছে। রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে পারে।

গণেশকাকার দোকানে সাইকেল রেখে দুজনে রিকশা নিলাম। যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের গাঁয়ের ওদিকে স্যাটেলাইট টাউনশিপ হচ্ছে বলে কিছু শুনেছেন?

গণেশকাকা বললেন, কত কিছুই তো হবোহবো হয়। দেখা যাক শেষ অবধি। তবে শুনেছি হচ্ছে।

আজ একজন লোক আমাদের বাড়িটা দিবার জন্য এসেছিল।

কে বল তো!

তা জানি না। শুনলাম পারিজাতবাবুর লোক।

গণেশকাকা সরল সোজা মানুষ। নামটা শুনেই জিব কেটে বললেন, ও বাবা, সেই তো স্কুলের সেক্রেটারি।

শুনে বুকটা হঠাৎ দমে গেল। বললাম, নোকটা কেমন?

ভাল তো কেউ বলে না। তবে টাকা আছে, ক্ষমতা আছে। আজকাল ওসব যার আছে সেই ভাল।

এ লোকটাই কি তার বউকে খুন করেছিল?

লোকে তো তাই বলে। তোকে কে বলল?

ফুলমাসি।

গণেশকাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, পারিজাত অনেকদিন ধরেই তোদের বাড়ি কিনতে চাইছে। তোর দাদু অবশ্য রাজি হয়নি।

আমার মনটা খারাপ লাগছিল। স্কুলের চাকরিটা আমার হবে না জানি। তবু তো আশার বিরুদ্ধেও মানুষ আশা করে। এখন পারিজাতবাবু যদি জানতে পারেন যে জমিটা আমাদের এবং আমরা বেচতে রাজি নই তবে হয়তো চটে যাবেন, আর আমার চাকরিটাও হবে না।

বিচিত্র এই কার্যকারণের কথা ভাবতে ভাবতে আমি বললাম, অসীমা দিদিমণির কি চাকরির ব্যাপারে সত্যিই হাত আছে?

দেখাই যাক না।

পারিজাতবাবু লোকটা কে? আগে নাম শুনিনি তো!

এখানকার লোক নয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

অসীমা দিদিমণির জন্য তাদের বাইরের ঘরে আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। উনি এখনও ফেরেননি। আমার হাই উঠছিল। গণেশকাকা কেমন যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে জবুথবু হয়ে বসেছিলেন। যেন এইসব শিক্ষিতজনের ঘরবাড়ি আসবাবপত্রকেও সমীহ করতে হয়।

গণেশকাকাকে আমি কাকা ডাকি, অথচ তার বউকে মাসি। কেন ডাকি তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। কোনও সূত্র পেলাম না। ছেলেবেলা থেকেই ডেকে আসছি, এইমাত্র। পারুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে অবশ্য সম্পর্ক এবং ডাক পালটে যেত। ফুলমাসিকে মা বলে ডাকতে অসুবিধে হত না, কিন্তু গণেশকাকাকে গাল ভরে বাবা ডাকতে পারতাম না

নিশ্চয়ই। পারুলের শ্বশুরবাড়ি এই শহরেই। আমি কখনও যাইনি। কালেভদ্রে দেশের বাড়িতে এলেও আমি পারুলের শ্বশুরবাড়িতে যাই না ভয়ে। যদি ওরা কিছু মনে করে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অসীমা দিদিমণি ঘরে ঢুকলেন। তটস্থ গণেশকাকা উঠে হাত কচলাতে লাগলেন। মুখে একটু নীরব হেঁ-হেঁ ভাব।

অসীমা দিদিমণির মতো এরকম বিষণ্ণ চেহারার মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। চেহারাটা রুক্ষ এবং শুকনো। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওঁর চোখমুখ যেন গম্ভীর হতাশা, গভীর ক্লান্তি এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে মাখা। একটুও হাসির চিহ্ন নেই কোথাও। আমার পরিচয় পেয়ে গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আমাকে নয়, উনি মনের মধ্যে অন্য কোনও দৃশ্য দেখছেন।

# ৩. পারিজাত

লোকটা চেঁচাচ্ছে ফটকের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গলায় প্রগাঢ় মাতলামি। আমার ঘর থেকে অত দুরের চেঁচানি শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাল বোঝা যায় না। তবে আমি জানি, লোকটা আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। খুবই অশ্লীল, অসাংবিধানিক ভাষায়। ওর কথায় কান বা গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। কারণ আমার ধারণা, যে কোনও গরিব দেশেই এরকম দৃশ্য হামেশাই দেখা যায়। কিছু লোকের বদ্ধমূল ধারণা, তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্য কিছু লোক দায়ী। এদের যত রাগ সব সেই অন্যদের বিরুদ্ধে। যারা জোট বেঁধে মিছিলে সামিল হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে তারস্বরে নালিশ জানায় তারাও এরকমই। দারিদ্র্যসীমা নামক যে রেলবাঁধটা আমি দেখতে পাই এরা হচ্ছে তার ওপারের লোক।

অরিন্দমবাবু একটু সচকিত হয়ে বললেন, বাইরে একটা লোক খুব চেঁচাচ্ছে না?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বলছে বলুন তো?

আমি সত্য গোপন না করে আরও বিনীতভাবে বলি, আমাকে গালগাল দিচ্ছে।

আপনাকে। কেন?

ওর ধারণা ওর দুর্ভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী।

সে কী! আপনি ওর কী করেছেন?

আমি নাটকীয়ভাবে একটু চুপ করে থাকি। গল্পটা খুবই সাধারণ এবং এরকম ঘটনা আকছার ঘটছেও। অক্ষয় নামে ওই লোকটির একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ ছিল। বেশিরভাগই

গ্যাস আর ইলেকট্রিক ওয়েলডিং-এর কাজ হত তাতে। লাভ মন্দ হত না একসময়ে। কিন্তু লোকটা দুর্দান্ত মালখোর, তেমনি সাংঘাতিক মেয়েমানুষের প্রতি লোভ। খালপাড়ের এক সেয়ানা হুঁড়ি অক্ষয়ের রসকষ টেনে নিচ্ছিল। এসব লোকের যা হয়, হঠাৎ একদিন নগদ টাকায় টান পড়ে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই আস্থায় একদিন কারখানাটা আমাকে বিশ হাজারে বেচে দেয়, দাম যে খুব খারাপ পেয়েছে তা নয়। কিন্তু মুশকিল হল, টাকাটা নিয়েই ফুকে দিয়েছে। এদিকে আমার লক্ষ্মীমন্ত হাতে পড়ে কারখানাটা এখন দিব্যি চলছে। সাত-আটজন লোক খাটে। লোকটার সেই থেকে রাগ। কিন্তু আমি ওর ওপর রাগ করতে পারি না। মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র ভারতবাসীরই ও একজন।

ঘটনাটা যতদূর সম্ভব নিরলঙ্কার এবং সরলভাবে আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দমবাবুকে শোনালাম।

উনি একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু লোকটা এরকম চেঁচায় আর আপনিও সহ্য করে যান? স্টেপ নে না কেন?

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। অরিন্দমবাবুর মাথা নিশ্চয়ই অতি পরিষ্কার এবং ঝকঝকে। নইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতেন না। আমার মাথা তত পরিষ্কার নয়। অনেক কুটিলতা-জটিলতার রাস্তা আমাকে পেরোতে হয়। তবে পাবলিসিটির ব্যাপারটা আমি অরিন্দমবাবুর চেয়ে ভাল বুঝি। ওই যে অক্ষয় চেঁচায় এবং আমি ওকে তাড়িয়ে দিই না এটাও লোকে লক্ষ করে। চেঁচাতে চেঁচাতে, গালাগাল দিতে দিতে অক্ষয় একসময় ক্লান্ত হয়ে চলে যায়, লোকেও রোজ শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা আর অক্ষয়ের কথায় গুরুত্ব দেয় না, বরং আমি যে অক্ষয়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিই না এটাই ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে। উপরন্তু অক্ষয়ের কোনও গালাগালিই আমাকে স্পর্শ করে না। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার ওপাশে ছিলাম তখন এর চেয়ে বহুগুণ খারাপ গালাগাল আমি নিত্যদিন শুনেছি।

আমি অরিন্দমবাবুকে তার জিপগাড়িতে তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যাই এবং অক্ষয়ের মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে সামনে দেখে অক্ষয়ের উৎসাহ চতুগুণ বেড়ে যায়। সে সোল্লাসে লাফাতে লাফাতে বলতে থাকে, এই সেই হারামির বাচ্চা, এই সেই শুয়োরের বাচ্চা, এই ব্যাটা খানকির পুত আমার কারখানা হাতিয়ে নিয়েছে, আমার বউকে বিধবা করেছে...ইত্যাদি। শেষ কথাটা অবশ্য ডাহা মিথ্যে। অক্ষয়ের বউ বহুদিন আগে মারা গেছে, কাজেই তার বউয়ের বিধবা হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যদি বউ বেঁচে থাকতও তাহলেই বা অয় বেঁচে থাকতে কীভাবে তাকে আমি বিধবা করতাম সেটা আমার মাথায় এল না।

অক্ষয়ের এই আস্ফালন ও গালমন্দ কিন্তু বাস্তবিকই আমি উপভোগ করি। ভির ভিতরে আমার একধরনের শিহরণ হতে থাকে। পৃথিবীকে আমি কতখানি ডিসটার্ব করতে রেছি অক্ষয় তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকার সময় আমি প্রায়ই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতাম না। আমরা আছি কি নেই তা নিয়ে বহুবার সংশয় দেখা দিত। আমাদের বাঁচা বা মরা কোনওটাই টের পেত না বিশ্ববাসী, আমাদের খিদে লজ্জা ভয় সবই ছিল আমাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই যখন অক্ষয় বা তার মতো কেউ আমাকে গালমন্দ করে, আমার বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, লোকজনকে ধরে ধরে আমার কুৎসা গেয়ে বেড়ায় তখন আমি আমার ব্যাপক অস্তিত্বটাকে টের পাই। আমার অস্তিত্ব চারদিকে নাড়াচাড়া ফেলছে, আমাকে ঘিরে ঘটছে ঘটনাবলী। আমি আর উপেক্ষার বস্তু নই। আমি যে আছি তো লোকে টের পাচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। গাঢ় মেঘ ছিল আকাশে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আমি ঘরে ফিরে আসি।

চতুর্ভুজের সাইকেল এসে থামল বাইরে। ভেজা গা বারান্দায় একটু ঝেড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে বলল, বাকা বাঁশ আজও সোজা হল না।

আমি বললাম, বুড়ো যদি রাজি না হয়েই থাকে তবে তুমি আর শিগগির ওর কাছে যেয়ো না, বরং তার যে ছেলে কলকাতায় থাকে তার পাত্তা লাগাও। শুনেছি তার অবস্থা ভাল নয়। ভাল দাম পাওয়া যাবে শুনলে সেই এসে বুড়োকে রাজি করাবে।

চতুর্ভুজ একটু হতাশার গলায় বলল, সরকার যে ওদিকে ডেভেলপমেন্ট করবে তা বুড়ো জেনে গেছে।

আমি শান্ত স্বরেই বললাম, এসব খবর কি আর চাপা থাকে? কেউ না কেউ রটাবেই।

চতুর্ভুজ যে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। অথচ জমিটা ও কিনবে না, কিনব আমি। তবে ওর দুঃখ কীসের? আমার মনে হয়, অন্য লোকে যদি লটারি পায় তবে মানুষ যে সব সময়ে তাকে হিংসে করে তা নয়। অনেক সময়ে মানুষ সেই লোকটার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে এক ধরনের আত্মরতি করতে থাকে। এও হল তাই। এ জমি কিনে আমি যদি মোটারকম একটা দাও মারতে পারি তবে চতুর্ভুজ খুশি হবে।

কিন্তু মোটারকম দাঁও মারার ব্যাপারটা এখনও অনিশ্চিত। গভর্নমেন্ট যে ঠিক ওই জায়গাতেই ডেভেলপমেন্ট করবে তা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়নি। তবে এই অঞ্চলে কিছু কৃষিনির্ভর, শিল্প বা অ্যাগ্রো ইনডাসট্রি গড়ে তোলার একটা কথা চলছে। মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির জমিটা কিনতে পারলেও সেটা আমার পক্ষে একটা জুয়া খেলার সামিলই হবে। যদি শেষ অবধি ওদিকে ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে টাকাগুলো আটকে রইল। তবে অরিন্দমবাবু এবং অন্যান্য জানবুঝওলা অফিসাররা আমাকে গোপনে জানিয়েছেন, মউডুবিই সেই চিহ্নিত জায়গা।

আমি সহজে হতাশ হই না। কারণ আমি বড় হয়েছি এক মস্ত অন্ধকার বুকের মধ্যে নিয়ে। আমার জীবনটাও নানারকম জুয়া খেলার সাফল্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আচমকাই চতুর্ভুজকে জিজ্ঞেস করলাম, নারকোল ডিহাইড্রেট করা যায় না?

চতুর্ভুজ ক্যাবলার মতো মুখ করে বলল, তা তো জানি না।

মউডুবিতে খুব নারকোল হয়।

তা হয়। তবে লোকে টাটকা নারকোল পেলে কি আর নারকোলের গুঁড়ো নিবে?

আমি টপ করে বললাম, আদাও তো বাজারে টাটকা পাওয়া যায় তবে আদার গুঁড়ো বিক্রি হয় কেন?

চতুর্ভুজ অবাক হয়ে বলে, হয় নাকি?

না হলে বললাম কেন? গুড়ো নারকোলের অনেকগুলো প্লাস পয়েন্ট আছে। আজকালকার বউ-ঝিরা ঘরের কাজ বেশি করতে চায় না। নারকেল কোরানোও এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। ডিহাইড্রেটেড নারকোল পেলে তারা খুশিই হবে। তাছাড়া উত্তর ভারতের একটা মস্ত এলাকায় নারকোল হয় না। দক্ষিণ ভারত বা এদিক থেকে যা যায় তার দাম সাবাতিক। সুতরাং ডিহাইড্রেটেড নারকোলের বাজার আছে। অবশ্য যদি করা যায়।

চতুর্ভুজ এ কথাতেও বেশ উত্তেজিত হয় এবং বোধহয় স্বপ্ন দেখতে থাকে। যদিও ডিহাইড্রেটেড নারকোল ঘেঁ আমি আরও বড়লোক হলেও তার এক পয়সা লাভ নেই। সু সে আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে একটা গোলাপি ভাবীকালের কথা ভাবতে থাকে, তার চোখেমুখে একটা সশ্রদ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব ফুটে ওঠে। সে বলে, মউডুবিতে এক সাহেবের একটা পোয় নারকোলবাগান আছে। ইজারা নেওয়ার চেষ্টা করব?

দাঁড়াও, আগে খোঁজ নিই নারকোলের ডিহাইড্রেশন সম্ভব কি না।

চতুর্ভুজ সে কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলে, বঙ্কিম গাঙ্গুলিরও মেলা নারকেল গাছ। ফাঁকা জমিতে কেরালার কিছু জলদি জাতের আরও চারা লাগিয়ে দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে ফলন পেয়ে যাবে।

আমি তাকে আর থামানোর চেষ্টা করি না। গরিবের তো স্বপ্নই সম্বল, হোক না তা অন্যকে নিয়ে। চতুর্ভুজ নারকেল গাছের বাই-প্রোডাক্টগুলোর কথাও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দড়ি, পাপোশ, হুঁকোর খেলো, পুতুল, অ্যাশট্রে, ছাইদানি, আরও কত কী!

আজ একটু দেরি করে অসীমা এল। দেরি হওয়ারই কথা। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের খুব জরুরি একটা মিটিং হয়ে গেল স্কুলে আজ। প্রসঙ্গ ছিল, করাপশন। স্কুলের বেশ কিছু টাকা নয়ছয় হয়েছে, হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না, অডিটার অসন্তুষ্ট। এ সবই আমি আগে থেকে জানতাম।

আজ সন্ধে হয়ে গেছে এবং বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই আজ আমাদের বনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অসীমা তার বেঁটে ছাতাটা দরজার পাশে রেখে আধভেজা শরীরে ঘরে ঢুকতেই চতুর্ভুজ সবেগে বেরিয়ে গেল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে ডিস্টার্ব করতে নেই।

অসীমার মুখ চোখের চেহারা আজ আরও খারাপ। ওর ভিতরকার সব আলোই যেন নিভে গেছে। উপমাটা কারও কারও অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু আমি মানুষকে মাঝে মাঝে বাড়ি হিসেবেও দেখি। এক-একটা মানুষকে দেখে মনে হয়, সব ঘরে আলো জ্বলছে, জানলা দরজা খোলা, পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, এইসব মানুষেরা হা হা করে হাসে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, এদের জীবনে দুঃখ বড় ক্ষণস্থায়ী। কিছু কিছু মানুষের দু-একটা ঘরে আলো জ্বলে, বেশিরভাগ জানালা কবার্টটাই থাকে বন্ধ। আর কিছু মানুষ জন্মদুঃখী। ওদের বড়জোর বাথরুমে একটুখানি আলো জ্বলে। জানান দেয় যে, লোকটা আছে। অসীমার আলোর জোর নেই, জানালা কপাট সবই প্রায় বন্ধ। তবু এক চিলতে কপাটের ফাঁক দিয়ে একটু যে আলো দেখা যেত তাও যেন কে আজ এক ফুকারে নিভিয়ে দিয়েছে।

সে বসলে আমি জিজ্ঞেস করি, আজ মিটিং-এ কী হল?

অসীমা মাথা নেড়ে বলল, কিছু হয়নিখুব গণ্ডগোল হয়ে মিটিং ভেঙে গেল।

সেরকমই কথা। তবু আমি মুখখানা নির্বিকার রেখে বললাম, কী নিয়ে গণ্ডগোল?

কমলাদি তোমার এগেনস্টে চার্জ আনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কয়েকজন কমলাদির এগেনস্টে কথা বলতে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক কেন?

টিচাররা এতকাল কেউ কমলাদির বিরুদ্ধে একটিও কথা বলত না, দু-একজন ছাড়া। আজ অনেকেই দেখলাম কমলাদির বিরুদ্ধে। তবে তারা যা বলছিল তা আমাদের আজকের এজেন্ডায় ছিল না।

আজ তো করাপশান নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তোমাদের।

হ্যাঁ, স্কুল ফান্ড এবং অডিট রিপোর্ট নিয়ে সে আলোচনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

কমলাদির রি-অ্যাকশন কী?

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর যখন ওঁর বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলতে লাগল কয়েকজন তখন একদম পাথরের মতো চুপ করে গেলেন। সারাক্ষণ একটিও কথা বলেননি।

আমি অসীমার মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম। বুঝতে পারছি, অসীমা আজকের মিটিং ভণ্ডুল হওয়ায় খুশি হয়নি। কমলা সেন জব্দ হওয়াতেও আহ্লাদিত হয়নি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। আমার মন বলছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই কমলা সেনকে রেজিগনেশন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অসীমার হেডমিসট্রেস হওয়া আটকানোর কেউ নেই। তবু অসীমা খুশি নয়। আশ্চর্য।

আমি মৃদু স্নেহসিক্ত স্বরে বললাম, তোমার কি শরীর ভাল নেই অসীমা?

কেন বলো তো!

তোমাকে ভাল দেখছি না।

মনটা ভাল নেই। স্কুলটার কী হবে তাই ভাবছি।

কী আর হবে, উঠে যাবে না। ভয় নেই।

তা নয়। কমলাদি চলে গেলে স্কুলটার আর সেই গুডউইল থাকবে না। এই স্কুলের জন্য উনি একসময়ে নিজে বাহান্ন ভরি সোনার গয়না দিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা তো জানো।

জানি।

স্কুল স্কুল করে পাগল। এখনও ঘুরে ঘুরে দেখেন কোথাও ঝুল জমছে কি না, কোথাও ঘাস বড় হয়েছে কি না, কোনও বেঞ্চির পেরেক উঠে আছে কি না। ওঁর মতো এরকম আর কে করবে?

আমি নিরীহ মুখ করে বললাম, পৃথিবীতে কেউ তো অপরিহার্য নয়।

অসীমা আমার দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম ওর দৃষ্টি আমাকে ভেদ করে বহু দুরের এক আভাসিত রহস্যময় অন্ধকারকেই দেখছে বুঝি।

আমি জানি কথা ও নীরবতা এই দুইয়ের আনুপাতিক ও যথাযোগ্য সংমিশ্রণের দ্বারাই মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। কেবল কথা বলে গেলেই হয় না, আবার শুধু চুপ করে থাকলেও হয় না। কখন কথা বলতে হবে এবং কখন নয় তা বোঝা চাই।

পরিস্থিতি বিচার করে আমি বুঝলাম, এখন চুপ করে থাকাটা ঠিক হবে না। তাই আমি খুব মোলায়েম গলায় বললাম, একসময়ে পণ্ডিত নেহরু যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা ভাবতাম নেহরু মারা গেলে বুঝি দেশ অচল হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হয়নি। রাশিয়ায় স্ট্যালিনের পরও দেশ চলেছে, মাওকে ছাড়াও চলছে চিন।

অসীমার দৃষ্টি দুর দর্শন থেকে নিবৃত্ত হল না। তবে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, কমলাদির জায়গায় আমি হেডমিসট্রেস হলে কেউ আমাকে পছন্দ করবে না।

কথাটা নির্মম সত্যি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলাম। মুখটা একটু হাসি-হাসি করে বললাম, কমলাদির অবদান তো কম নয়। এতকাল তিনিই তো একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন। কিন্তু আমরা যেমন নেহরুর পর ইন্দিরা গাঁধীকে মেনে নিয়েছি, তেমনি তোমাকেও সবাই একদিন মেনে নেবে।

তুলনাটা অসীমাকে স্পর্শ করল না। খুব সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। সহজে ওকে প্রভাবিত করা যায় না। একটু ধরা গলায় বলল, স্কুলকে আমিও ভালবাসি। কিন্তু কমলাদি অন্যরকম। স্কুলটাই ওঁর প্রাণ। আমার তো মনে হয় চাকরি ছাড়লে উনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

আমি একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাদের তো কিছু করার নেই।

জানি।-বলে চুপ করে রইল অসীমা।

আমি অসীমার মনোভাব যে সঠিক বুঝি তাও নয়। কমলা সেন চাকরি ছেড়ে দিলে অসীমা হেডমিস্ট্রেস হবে, কিন্তু ওই লোভনীয় পদ ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ওকে আকর্ষণ করে না। কেন করে না তা ভেবে আমি বিস্মিত হতে পারতাম। কিন্তু আমার বিস্ময়বোধটা বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখে দেখে লুপ্ত হয়ে গেছে। বিচিত্র, বহুমুখী ও বিটকেল চরিত্রের লোকে দুনিয়াটা ভরা। একজন বিচিত্র মানুষের কথা আমি জানি। খুবই বিচিত্র চরিত্রের লোক। গাঁয়ের কয়েকজন কামার্ত পুরুষ একবার একজন সুন্দরী যুবতীর প্রতি লোভ করেছিল। মেয়েটা যেখানে যেত সেই পথেরই আশেপাশে ঘাপটি মেরে থাকত তারা। মেয়েটা ভ্রূক্ষেপও করত না। লোকগুলো নানা রকম ফাঁদ পেতে পেতে যখন হয়রান হয়ে পড়ল তখন সেই বিচিত্র লোকটি একদিন এসে জুটল তাদের দলে। জিজ্ঞেস করল,

তোদের মতলবখানা কী বল তো? লোকগুলো কাচুমাচু হয়ে বলল, ঠাকুর ভাই, ওই মেয়েটা যে আমাদের পাত্তাই দেয় না, তার একটা ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো শুনি বিস্তর লোকের হরেকরকম, সমস্যার সমাধান করে বেড়াও। আমাদের এটুকু করে দাও দেখি। লোকটা বলল, এ আর কথা কী! মেয়েটা পুকুর থেকে কলসিতে জল ভরে ফিরছিল। লোকটা গিয়ে পিছন থেকে ডাক দিল, মা, ওমা। কেমন আছিস মা? মেয়েটা ওই মা ডাকে এমন উজ্জ্বল, এমন আলোকিত, এত লজ্জারুশ হয়ে উঠল যে, বহুগুণ সুন্দর দেখাল তাকে। মিষ্টি হেসে বলল, ভাল আছি বাবা, তুমিও ভাল থেকো। লোকটা একগাল হেসে কামার্ত সেই লোকগুলোর কাছে এসে বলল, দেখলি। ভারী সোজা মেয়েদের বশ করা। একবার মা যদি ডেকে ফেলতে পারিস তাহলেই কেল্লা ফতে। মেয়েটাও বশ হল, ভিতরকার শক্তটাও বশ হল। এরপর থেকে সেই লোকটা বোজ সেই লোকগুলোকে তাড়া দিত, ডাক, মেয়েটাকে মা বলে ডাক। ডেকেই দেখ না, কী হয়। তা সেই লোকগুলো অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ডেকেই বসল, মা। আর সেই মা ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কাধ থেকে ভূতটা নেমে গেল।

বলতে কী, এইসব বিচিত্র ও বিটকেল লোককে আমি ভয় খাই। কাঁধ থেকে ভূত নামানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং কাঁধে কিছু কিছু ভূত সর্বদা বসে ঠ্যাং দোলাতে থাকুক। তাতে দুনিয়াটা অনেক স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী হয়। হেডমিসট্রেস হওয়ার সম্ভানায় অসীমার আনন্দ না হওয়াটা আমার চোখে ভূতের অভাব বলেই ঠেকল। তবু আমি বিস্মিত হলাম না। কারণ এরকম আমার দেখা আছে।

অত্যন্ত সৌহার্দ্যের গলায় আমি বললাম, কমলা সেন যতই এফিসিয়েন্ট হোক অসীমা, একটি স্কুলের হেডমিসট্রেসের পক্ষে চরিত্রটা মস্ত বড় কথা।

অসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উঠল।

বলতে কী, আজ আমাদের প্রেমপর্বটা বেশ দীর্ঘক্ষণই চলেছে। অন্যান্য দিন এতক্ষণ আমরা প্রেম করি না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষাকালের ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। সহজে থামবে না, তাই অসীমাকে যেতে নিষেধ করে লাভ নেই। এই বৃষ্টিতে ওর তেমন কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

অসীমা ছাতা খুলে বারান্দা থেকে নামতে গিয়েও কী ভেবে ফিরে এল।

শোনো।

বলো।

আমাদের স্কুলে ম্যাথমেটিকসের ভ্যাকেনসিতে কি ক্যান্ডিডেট ঠিক হয়ে গেছে?

মোটামুটি। কেন বলো তো?

আমাকে একজন খুব ধরেছে একটা ছেলেকে ওই চাকরিটা দেওয়ার জন্য।

ছেলেটা কে?

তুমি চিনবে না। কলকাতায় থাকে।

আমরা তো ঠিকই করেছি, লোকাল ক্যানডিডেটকে প্রেফারেনস দেব।

এই ছেলেটিও লোকাল। মউডুবিতে বাড়ি।

ওর হয়ে কে তোমাকে ধরেছে?

সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গণেশবাবু। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ছেলেটা আমার কাছে এসেছিল। খুব স্মার্ট আর সিরিয়াস ছেলে।

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। জহরবাবুর মেয়েও অঙ্কে অনার্স। গতকাল রাতে আমি একরকম ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে, জহরবাবুর মেয়েকেই এই চাকরিতে বহাল করা হবে। এখন অসীমার ক্যানডিডেট আবার গোলমাল পাকাল।

বললাম, ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিও তত একবার দেখব। মউডুবিতে বাড়ি বলছ? কোন বাড়ির ছেলে?

অত খোঁজ নিইনি। কেন বলো তো?

এমনি। অঙ্কের পোস্টটার জন্য জহরবাবুর মেয়েও ক্যানডিডেট। বি এসসি বি এড।

জানি।

এই ছেলেটার কোয়ালিফিকেশন কী?

অঙ্কে অনার্স, তবে বি এড নয়।

তা হলে তো মুশকিল।

অসীমা একটু ধৈর্যহারা গলায় বলল, তোমাকে অত ভাবনা করতে হবে না। যদি পারো দেখো। চাকরি দিতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ছেলেটাকে আমি ভাল করে চিনিও না। তবে একবার দেখেই বেশ ভাল লেগেছিল, এই যা। খুব স্পিরিটেড ছেলে।

আমি চুপ করে রইলাম। স্পিরিটেড ছেলেদের সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা নেই। কোনও মানুষের বাড়তি স্পিরিট থাকলে অন্যদের ভারী মুশকিল। বাড়তি স্পিরিট যাদের থাকে তারা সর্বদাই সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ব্যাপারে অন্যদের গুতিয়ে ফেরে। কাছাকাছি কোনও স্পিরিটেড লোক থাকলে বরং সাধারণ মানুষের কাজকর্মের অসুবিধেই বেশি।

অসীমা চলে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ আমার চেয়ারে বসে রইলাম। বাইরে বৃষ্টির তেজ বাড়ল। হুংকার দিয়ে একটা বাতাসও বয়ে গেল সেইসঙ্গে। আরও মেঘ নিয়ে এল বুঝি। এক ঘন ছেদহীন আদিম বৃষ্টিতে ছেয়ে গেল চারধার। বৃষ্টির দুটো দিক আছে। একটা তার সৌন্দর্যের দিক, যা নিয়ে মেঘদূত বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি, অন্যদিকে বন্যা, দুর্গতি এবং তথা অর্থনীতি। আমি দ্বিতীয় দিকটা নিয়েই ভাবি। এবারের বর্ষার চেহারা তেমন ভাল নয়।

এফ সি আইকে আমার তিনটে গুদাম ভাড়া দেওয়া আছে। ম্যানেজার শুভ্রাংশু সেন আমার বন্ধু-লোক। ফুড করপোরেশনে নতুন ঢুকেছে। বৃষ্টিটার আদিম হিংস্রতা টের পেয়েই আমি তাকে ফোন করি।

কী করছেন সেন সাহেব?

শুভ্রাংশু কিছু একটা খাচ্ছে। পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম। ইলিশ ভাজা কি? হতে পারে। আজ বিকেলেই দুটো ইলিশ আমি নিজেই পাঠিয়েছি। দুটোর দরকার ছিল না। শুভ্রাংশুরা মোটে সাড়ে তিনজন লোক। স্বামী স্ত্রী আর একটা পাঁচ আর একটা সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা। চিবোতে চিবোতেই শুভ্রাংশু বলে, এই ঘরে বসে হাল্লাগুল্লা হচ্ছে আর কী। বৃষ্টির দিন, কিছু করার নেই।

হাল্লাগুল্লাটা কী জিনিস?

শুভ্রাংশুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, এই গ্যাঞ্জাম আর কী। বাচ্চারা আর আমি মিলে মিসেসকে একটু টিজ করছিলাম।

ইলিশটা কেমন ছিল?

দারুণ! দারুণ! মিসেস ভাজছেন আর আমরা খাচ্ছি। খেতে খেতেই হাল্লাগুল্লা হচ্ছে। মিসেস আবার ইলিশের গন্ধ সইতে পারেন না। নাকে ওডিকোলোন মাখানো রুমাল চাপা দিয়ে ভাজছেন।

বলেন কী? মিসেস সেন ইলিশ পছন্দ করেন না জানতাম না তো!

চূড়ান্ত বেরসিক আর কী! ইলিশ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিউলি ফুল এসব যার ভাল না লাগে সে মানুষ নয়, পাথর।

আমি সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, চিংড়ি কেমন বাসেন উনি?

বাসেন। চিংড়িটা বাসেন। তবে সে আমরাও বাসি মশাই।

ঠিক আছে। আর একটা কথা, আপনার মিসেস কেন মাছ ভাজছেন? আপনাদের তো একজন রাধুনি আছে।

আছে। কিন্তু সে দেশে গেছে। আর একবার দেশে গেলে ওরা একেবারেই যায়।

খুব অসুবিধে তো তা হলে!

আর বলেন কেন? মিসেস একদম ফরটি নাইন।

আমি একটু হেসে বললাম, আমার ইটের ভাটি থেকে একটা কামিনকে পাঠিয়ে দেবোখন কাল।

পাঠাবেন? আঃ, বাঁচলাম।

গলা খাকারি দিয়ে বললাম, সেনসাহেব, গোডাউনে স্টক কেমন?

কেন বলুন তো। যতদূর জানি, ভালই।

এবারকার বর্ষাটা আমার ভাল লাগছে না। যদি ফ্লাড হয় তবে দুবছর আগেকার মতো জায়গাটা ফের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। সেবার টানা কুড়ি দিন কোনও সাপলাই আসতে পারেনি।

হ্যাঁ, জানি।

এবারও যদি সেই বৃত্তান্ত হয়, তা হলে? সেবার গোডাউন লুট হয়েছিল।

শুভ্রাংশু একটু চিন্তিত গলায় বলে, আমাদের সিকিউরিটি খুব ভাল নয়। এমনিতেও খুচখাচ চুরিচামারি হচ্ছে। কী করা যায় বলুন তো।

আমি বিনীতভাবে বললাম, দেশের সব গুদাম থেকেই অল্পবিস্তর চুরি হয়, এমনকী ডিফেন্সের গুদাম থেকেও। ওটা কথা নয়। কথা হল লুট নিয়ে।

শুভ্রাংশু চিন্তিতভাবে বলে, আগের লুটটা আমার আমলে হয়নি। তখন মিস্টার রায় ছিলেন। ঘটনার ডিটেলস জানি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি জানি।

এখানকার লোকেরা কি একটু হোসটাইল ধরনের?

আমি হাসলাম। বললাম, সাধারণ মানুষেরা কখনওই হোসটাইল নয় সেন সাহেব। তবে তাদের হোসটাইল করে তোলা যায়। এখানে এমন কয়েকজন লোক আছে যারা কাজটা খুব সুন্দর পারে।

তারা কারা?

জানলেই বা তাদের আপনি কী করবেন?

কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না?

আমি নিরেট গলায় বললাম, না। কারণ তারা নেতা বা নেতা-স্থানীয় লোক।

ওঃ! খুব হতাশ শানাল শুভ্রাংশুর গলা। বলল, তা হলে অবশ্য কিছু করার নেই।

না। কিছু করার নেই সেন সাহেব। সরকারি মাল জনসাধারণ সুট করবে, এতে কার কী করার আছে? তবে টনাটা যদি ঘটেই যায় তা হলে আপনাকে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, চাকরির ক্ষেত্রেও কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে একটা দাগ থেকে যাবে। আপনি ইয়ং ম্যান।

কিন্তু কিছু করারও তো নেই। আরও ফোর্স চেয়ে পাঠাতে পারি।

তাতে লাভ হবে না।

সেটা জানি। আর কী করব?

ভাবুন সেন সাহেব, ভাবুন, দুর্যোগ আসছে। ডার্ক ডেজ আর অ্যাহেড।

শুভ্রাংশু হতাশ গলায় বলল, এ, সন্ধেটাই মাটি করে দিলেন মশাই। দিব্যি হালাগুল্লা করছিলাম। কেন ঝামেলা মাচালেন বলুন তো?

বৃহত্তর ঝামেলা অ্যাভয়েড করার জন্য।

কিন্তু অ্যাভয়েড করব কী করে তা তো বললেন না।

অত উতলা হবেন না। অনেক কিন্তু আছে। ধরুন বন্যা যদি না হয় বা নেতারা যদি ভুখা জনসাধারণকে না খ্যাপায় তা হলে ঝামেলা হবে না। আমি শুধু বৃষ্টির রকমটা দেখে আগাম আপনাকে সাবধান করে দিলাম।

এমনিতেই তো ফুড ব্যাপারটা সাংঘাতিক সেনসিটিভ। তার ওপর ফ্লাড-পোন এরিয়া। নাঃ, আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন, ইলিশটার কোনও টেস্ট পাচ্ছি না আর।

দোষ ইলিশের নয় সেন সাহেব। দোষ আপনার মনের। অত সহজে ঘাবড়ে যান কেন?

ঘাবড়ে যাই সাধে নয়। আমি এফ সি আই-এর লোক নই। সেনট্রাল অ্যাকাউনটসে দিব্যি দশটা-পাঁচটা নিরাপদ চাকরি করতাম। দুম করে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় সিলেকটেড হওয়ার পর ফুড়ে ঠেলে দিল। বিচ্ছিরি ডিপার্টমেন্ট। রোজ ঘেরাও, রোজ লেবার ট্রাবল। অফিসটা একেবারে নরক। ক্লাস ফোর স্টাফদের পর্যন্ত কানো যায় না। তার ওপর যদি গুদাম লুট হয় তো সোনায় সোহাগা। আপনার কী মনে হয়, ফ্লাড কি হবেই?

বৃষ্টির ধরনটা তো সেইরকমই। দুটো নদীর জল ডেনজার লেভেলের ওপরে উঠেছে।

ফ্লাড জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই।

আমি আবেগমথিত গলায় বললাম, ফ্লাডের আপনি কী জানেন সেনসাহেব? আমার কত কী ভেসে গেছে বন্যায়। খরায় জ্বলে গেছে কত কী। তখন আমারও সব লুটপাট করতে ইচ্ছে করত। আমি, আমরা বড় গরিব ছিলাম।

জানি। আপনার মুখেই শুনেছি।

সেইজন্যই বৃষ্টি দেখলে আমার মেঘদূতের কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে, আমার হাঁপানির রুগি বাবাকে যতবারকাথাকানি দিয়ে ঢাকতে যাচ্ছেন মা, ততবার দেখছেন, সব ভেজা। সপসপে ভেজা। ঘরের মধ্যে অবাধ ঘোলা জল, তাতে কেঁচো, ব্যাং, ঢোঁড়া সাপ, উচ্চিংড়ে, কত কী। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি সেন সাহেব?

না, শুনছি। ভারী প্যাথেটিক।

ভীষণ। আপনার কি কখনও লুটপাট করার ইচ্ছে হয়েছে সেন সাহেব?

না, কখনও নয়।

স্বাভাবিক। আপনি তো কখনও দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকেননি। ওপাশে যারা থাকে তাদের মধ্যে সর্বদাই ওরকম একটা ইচ্ছে কাজ করে। তবে ভয় পাবেন না। সাধারণত দারিদ্র্যসীমার নীচেকার মানুষেরা নিরীহ, বোকা, সংহতিহীন এবং ভিতু। দাদা বা নেতা গোছের কেউ এসে যদি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে বিশেষ একটি লক্ষ্যে চালনা করে তা হলেই বিপদ।

সে তো বটেই। খুব পাশুটে গলায় শুভ্রাংশু বলে।

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, জনসাধারণকে ভয়ের কিছু নেই সেন সাহেব, শুধু দাদা বা নেতাদের দিকে নজর রাখুন।

সেই কাজটাই কি খুব সোজা?

না। কোনও কাজই বড় সোজা নয় সেনসাহেব। আমি শুধু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু করার নেই আমার। তবে আমার আরও দুটো গুদাম আছে। যদি বিপদ বোঝেন তা হলে নতুন স্টক যা আসবে তা আমার গুদামে তুলে দেবেন।

কোনও রিস্ক নেই তো!

আমি একটু হেসে বললাম, সব কাজেই রিস্ক থাকে সেনসাহেব। তবু যদি রিস্ক অ্যাভয়েড করতে চান তা হলে না হয় আমার লোকজন আর লরি দিয়ে আমি মাল খালাস করিয়ে আনব।

আচ্ছা। ভেবে দেখি।

টেলিফোনটা আমি নামিয়ে রাখি। শুভ্রাংশুকে টেলিফোনে কথাটা বলার উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে আমিও জানি না। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর কাজ করে যায়। সেই ক্যালকুলেটর কখনও ভুল করেছে বলে নজির নেই। আমার মন বলছে এবারও আবার এই শহরে এবং আশেপাশে বন্যা হবে।

অজস্র মানুষ এসে জড়ো হবে শহরে। ভরে যাবে ইস্কুলবাড়ি, কলেজ, কাছারি, অফিস। যথারীতি রিলিফ আসবে দেরীতে। লোকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠবে পুঞ্জীভূত ক্রোধ। কেউ একজন সেই বারুদে খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি দেশলাই কাঠির আগুন ধরিয়ে দেবে। গত বছরের আগের বছর এই কাজটি করেছিল অধর।

স্পিরিটেড বলতে যা বোঝায় অধরও অনেকটা তা-ই। কমলা সেনের সঙ্গে তার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটি বাদ দিলে তার আর কোনও বন্ধ বা দুর্বলতা নেই। অধরকে তাই আমি কিছুটা ভয় পাই। আমার ধারণা অধর আমাকে ছোবল দেওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছে। বন্যা হলে সে সুযোগ অধর পেয়েও যাবে। এই অঞ্চলে রিলিফের চাল ও গম সাধারণত আমাকেই সাপলাই দিতে দেওয়া হয়। মোটামুটি পাকা চুক্তি। আমার নিজস্ব দুটো গুদাম আছে শহরের এক ধারে। আমার ধারণা অধর এবার সেখানে চড়াও হবে। জনতার ঢেউয়ে ভেসে যাবে দুটো গুদাম। যাক, তাতে ক্ষতি নেই। তার আগেই আমি গুদামের মাল সরিয়ে নেব। তা বলে দরিদ্র, মূর্খ, বঞ্চিত ভারতবাসীকে হতাশও করব না আমি। তারা যদি লুট করে তো করবে। তবে সুট করবে সরকারি জিনিস যা লুট করার অসাংবিধানিক অধিকার তাদের আছে।

জানালা দিয়ে আমি আরও খানিকক্ষণ বৃষ্টি দেখলাম। চমৎকার বৃষ্টি, হিংস্র, আদিম, ভয়ংকর।

সিংহীবাবুদের এই বাড়িটা বেশ বড়সড়। এর স্থাপত্যে নানা জায়গায় বেশ কারুকাজ আছে। অবশ্য সময়ের খাজনাও দিতে হয়েছে বাড়িটাকে। মেঝে ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে কয়েকটা ঘরে। দোতলায় দুটো ঘরে জল চোয়ায়। আমি সেগুলো মেরামত করিনি। কারণ এই প্রকাণ্ড বাড়িটায় থাকি মাত্র আমরা দুটি ভাইবোন এবং কয়েকজন দাসদাসী ও দুটো কুকুর, আর আছে হাঁস, মুরগি, খাঁচার পাখি ও গোটা দুই জারসি গরু। অন্যান্য বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কেউ সুখে, কেউ দুঃখে আছে। আমার দুটি ভাই কলকাতা এবং দিল্লিতে চাকরি করে। সম্পর্ক খুব ক্ষীণ, নেই বললেই হয়।

আমার বোন রুমা যদিও আমার কাছেই থাকে তবু তার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। প্রায়ই সে কলকাতায় খোঁপা বাঁধতে বা চুল ছাঁটতে বা ফাংশন করতে চলে যায়। যতদূর জানি সে সাইকেল, স্কুটার এবং মোটরগাড়ি চালাতে পারে। স্কুলে পড়ার সময় সে জিমনাস্টিকস করত। ভাল গান গাইতে এবং নাচতেও পারত। দেখতে সে মোটামুটি ভাল, মুখশ্রী তেমন সুন্দর না হলেও ফিগার অসাধারণ। ইদানীং সে কারাটে বা ওই জাতীয় কিছু শিখছে বলে শুনেছি। অতিরিক্ত শরীরচর্চার ফলেই বোধহয় সে তেমন মস্তিষ্কের চর্চা করতে পারেনি। কম্পার্টমেন্টাল হায়ার সেকেন্ডারি টপকেই সে মোটামুটি লেখাপড়া শেষ করে। তারপর সে মন দেয় পুরুষজাতির প্রতি। বলতে নেই পুরুষজাতির মধ্যে প্রবেশ করেই রুমা একটা ঝড় তুলেছিল, তার জনপ্রিয়তায় আমিও চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং তাকে ঠারেঠোরে বোঝাতে থাকি যে, মহিলারা সাধারণত একগামিনীই হয়ে থাকে। বহুগামিনী হওয়া মেয়েদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্যাপারটা রুমাও বুঝতে পারত। তবে কোন পুরুষটি তার উপযুক্ত হবে তা বেছে বার করতে হিমশিম খাচ্ছিল সে। শাড়ির দোকানে ঢুকলে মেয়েদের যে অবস্থা হয় আর কি। কোনওটাই পছন্দ হয় না বা একসঙ্গে অনেকগুলো হয়।

গন্ধর্ব নামটা জনগণের কেমন লাগে আমি জানি না। কিন্তু এই নামের লোকদের আমি সন্দেহের চোখে দেখি। গন্ধর্ব নামটার মধ্যেই একটা ধোঁকাবাজি আছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য এ নামের একটা লোককেই আজ অবধি আমি চিনি। রুমা অনেক বেছেগুছে এই গন্ধর্বকেই বিয়ে করেছিল। নামটা যেমনই হোক, গন্ধর্ব ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ নয়। রোগা, ফরসা ও সুদর্শন এই ছেলেটি ছিল অধ্যাপক। ছিল কেন, এখনও আছে। জাতি হিসেবে অধ্যাপকদেরও আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। দেদার ছুটি ভোগ করে করে এরা অল্প দিনেই ভীষণ কুঁড়ে হয়ে পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা একদম হারিয়ে ফেলে। বইপোকা হওয়ার ফলে এদের অধিকাংশেরই বাস্তববুদ্ধি কিছু কম হয়ে থাকে। গন্ধর্বর মধ্যে অধ্যাপকোচিত সব অপগুণই ছিল। ফলে বিয়ের দুবছরের মাথায় রুমা তাকে ডিভোর্স করে আমার কাছে ফিরে আসে। শোকে গন্ধর্ব মদ ধরে। মাতাল অবস্থাতেই

সে একদিন আমার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, দাদা আমাকে বাঁচান। রুমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

রুমাকে আমি জানি। আমাকে সে সামান্যতমও সমীহ করে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলেই সে আমার দিকে অত্যন্ত শীতল ও কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রুমা দাদা হিসেবে আমাকে স্বীকার করলেও মানুষ হিসেবে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে না তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই। সম্ভবত রুমা আমার উত্থানের গোপন ইতিহাসটিও জানে। তাই রুমাকে আমি ঘটাতে সাহস পাই না। গন্ধর্বর কাতর আবেদনে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমি তাকে একটি সুপরামর্শ দিয়ে বলি, গন্ধর্ব, রুমা একটু ফিজিক সেনট্রিক। যাকে শরীর- সর্বস্ব বলা যায় আর কি। হুট করে তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে বটে ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু আমি জানি, ওর বিয়ে করা উচিত ছিল কোনও ব্যায়ামবীরকে। যদি রুমার মন পেতে চাও তবে ব্যায়াম করতে থাকো। তোমার, বয়স এমন কিছু হয়নি, এখন শুরু করলেও পারবে।

বাস্তবিকই গন্ধর্ব ব্যায়াম শুরু করে দেয়। একটা জিমনাসিয়ামে ভর্তি হয়ে সে বছর দুই একতানমনপ্রাণে শরীরচর্চা করে যেতে থাকে। ফলও পায় হাতে হাতে। দুবছর বাদে তার ঘাড়ে গর্দানে দিব্যি পেশীবহুল স্বাস্থ্য হয়। ততদিনে অবশ্য রুমার আরও বহু গুণগ্রাহী জুটে গেছে। যে কোনওদিন সে দ্বিতীয় স্বামী নির্বাচন করে বসবে, সেইসময়ে একদিন আমারই প্ররোচনায় গন্ধর্ব এসে হাজির হয় এবং প্রায় জোর করেই রুমাকে তুলে নিয়ে যায়।

আমার ধারণা গন্ধর্বর সেই জোর খাটানোর ব্যাপারটা রুমা বেশ উপভোগ করেছিল। তাই বিশেষ চেঁচামেচি করেনি, সুড়সুড় করেই চলে গিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় দফার বিয়েটা টিকল মাত্র বছরখানেক। গন্ধর্বকে আবার ডিভোর্স করার মামলা ঠুকে ফিরে এসে রুমা আমাকে বলল, গন্ধর্ব ভীষণ আনকালচার্ড, একটা জংলি, ব্রুট।

আমি অবাক হলেও, মুখে কিছু বলার সাহস পেলাম না।

গন্ধর্ব একদিন অপরাধী মুখ করে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দাদা, আজকাল আমার শরীরের সবরকম খিদে বেড়ে গেছে। গায়ের জোরও হয়েছে সাংঘাতিক। ফাইনার সেনসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এই শারীরিক তেজ রুমা ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। এবার কী করব বলুন!

আমি বুদ্ধি খাঁটিয়ে বললাম, সব কিছুরই একটা প্রোপোরশন রাখতে হয় গন্ধর্ব। শরীরটা তোমার সাংঘাতিক হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দিকগুলো ডেভেলপ করেনি। আমার অ্যাডভাইস হল, একটু-আধটু নাচ আর গান শেখো। তাতে স্ট্রেংথের সঙ্গে পেলবতা যুক্ত হবে। বজের কাঠিন্যের সঙ্গে যোগ হবে ফুলের কোমলতা।

বছরখানেক যাবৎ গন্ধর্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ ও গান শিখছে। কী হবে তা জানি না। তবে খবর রাখি, নাচ-গানেও গন্ধর্ব খারাপ করছে না।

আমি সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠলাম। পারতপক্ষে আমি দোতলায় আসি না। শুধু দোতলায় খাওয়ার সময় ছাড়া। এই অঞ্চলটা রুমার। আসানসোল না কোথায় যেন ফাংশন করে আজ সকালেই রুমা ফিরেছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। খবরটা পেয়েছি মাত্র।

খুব পা টিপে টিপেই আমি ওপরে উঠলাম। রুমা হয়তো বিশ্রাম-টিশ্রাম করছে। সাড়া শব্দ করা ঠিক নয়।

খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই কিন্তু মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা বাংলা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে বসে বসে। আমার দ্বিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। আমার ভিতরটা সংকুচিত হয়ে গেল হঠাৎ।

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে খেতে বসি এবং ঘরের অন্য জিনিস দেখতে থাকি। টেবিলের দুধারে দুজনে বসলেও কমার সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বহু যোজনের।

রুমা সশব্দে সাপ্তাহিকটা টেবিলে আছড়ে ফেলে বলল, অসহ্য।

আমি বললাম, কী?

রুমা আমার দিকে চেয়ে তেতো গলায় বলে, তুমি ধারণা করতে পারো, গন্ধর্ব ফাংশনে গান গাইছে?

আমি যথেষ্ট অবাক হয়ে বলি, তাই নাকি?

তা নয় তো কী? আসানসোলে গিয়েছি ফাংশনে। দেখি মূর্তিমান হাজির। মুখটা খুব গভীর। তখনও বুঝতে পারিনি। ফাংশনের শুরুতেই দু-একজন আর্টিস্টের পর শুনি গন্ধর্বর নাম অ্যানাউনস করা হচ্ছে।

আমি সাগ্রহে বলি, তারপর?

তারপর আর কী শুনতে চাও? দেখি দিব্যি এসে স্টেজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, কেমন গাইছে?

রুমা কটকট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানি না।

রাগ করছিস কেন? কেমন গাইল?

রুমা একটা হাই তুলে ক্লান্তিসূচক দু-একটা শব্দ করে বলল, খুব খারাপ গাইছিল না। কিন্তু হঠাৎ ও গান ধরল কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।

হু!-বলে রুমা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

# ৪. অভিজিৎ

রিকশায় ফিরতে ফিরতে গণেশকাকা আমাকে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছিলেন, ইস্কুলে একটা গণ্ডগোল চলছে। পুরনো হেডমিসট্রেস নাকি রিজাইন করবে। যদি করে তবে হেডমিসট্রেস হবেন অসীমা দিদিমণি। চাকরিটা তোরই হবে। পারিজাতবাবু হচ্ছেন অসীমা দিদিমণির হাতের মুঠোর লোক। ওঁর সঙ্গে বিয়ে কিনা।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, অসীমা দিদিমণির বিয়ে নাকি?

হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। অসীমা দিদিমণি দেখতে ভাল নয়, বড্ড রোগাও। বিয়ের ব্যাপারে সেটা হয়তো কোনও বাধা হবে না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে যে গভীর বিষণ্ণতা সেটা ওর হবু স্বামী সহ্য করবে কী করে!

আমি গণেশকাকাকে বললাম, চাকরি হলে হল, আপনি বেশি ধরাধরি করতে যাবেন না।

গণেশকাকার এই দোষটা আছে। দোকানদারি করে করে কেমন যেন আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। সকলের সঙ্গেই বড্ড বেশি হাত কচলে কথা বলেন। সরকারি অফিসারস্টফিসারদের একেবারে দেবতার মতো খাতির দেন। এতটা বিনয় ব্যক্তিত্বহীনতারই নামান্তর। আর এত সব তেল-টেল দিয়ে চাকরি পেতে আমার ঘেন্না করে।

গণেশকাকা বললেন, আরে যুগটাই তো পড়েছে ওরকম। ধরাধরি না করলে কি কিছু হয়? ধরাধরি, ঘুষ এসবই তো আজকাল আইন হয়ে গেছে।

আমি সন্দিহান হয়ে বললাম, ঘুষও দিচ্ছেন নাকি?

গণেশকাকা অপ্রতিভ হেসে বললেন, আরে না, না। ঘুষ দিতে হয়নি। মাঝে মাঝে একটু দই কি মিষ্টি দিয়ে পয়সা নিইনি আর কি।

কবে দিয়েছেন?

গণেশকাকার একটা সুবিধে,কথা চেপে রাখতে পারেন না। খুব লজ্জা পেয়ে মাথাটাথা চুলকে বললেন, গতকালই দুসের দই আর পঁচিশটা রসগোরা পাঠিয়েছিলাম।

অসীমাদি নিলেন?

নিয়েছে। তবে বলেছে দাম নিতে হবে। তা সে দেখা যাবে। তোর চাকরিটা যদি হয়ে যায় তো ওটুকু খরচ কি আর গায়ে লাগবে?

আমি একটু হেসে বললাম, আমাকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে আপনার লাভ কী?

গণেশকাকা এ কথার জবাব দিলেন না। বললেন, পারিজাতবাবুকে হাত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু লোকটা মহা ধুরন্ধর।

আমি আর কথা বললাম না। দোকানে নেমে সাইকেলটা নিয়ে শহরে চক্কর দিতে বেরিয়ে পড়লাম। গণেশকাকা মিষ্টি খেয়ে যেতে বললেন। খেলাম না।

এ শহর আমার অনেক দিনের চেনা। রাস্তাগুলো সরু এবং ভাঙা। মলিন ও জীর্ণ সব বাড়িঘর। কোথাও বেশ ঘন কচুবন, আগাছা বা জঙ্গল। সরকারি দফতর কয়েকটা হয়েছে বটে, আর কিছু সরকারি কোয়ার্টার। আর তেমন কোনও উন্নতি বা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যদি চাকরি পাই তা হলে এই শহরে এসে চাকরি করতে আমার কেমন লাগবে? কেমন লাগবে উডুবিতে দাদুর কাছে থাকতে? বোধহয় খুব ভাল লাগবে না।

শহর ছাড়িয়ে আমি গাঁয়ের পথ ধরলাম। জলভারনত মেঘ গুমগুম করছে। চড়াৎ চড়াৎ করে আকাশ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। আমি সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। বহুকাল

সাইকেল চালিয়ে অভ্যাস নেই। রাস্তাও খারাপ। পায়ের ডিম আর কুঁচকিতে টান লাগছে। তবু বৃষ্টিকে হারিয়ে পৌঁছে গেলাম বাড়িতে। আমি দাওয়ায় উঠতে না উঠতেই ঝপাং করে নেমে এল বিস্ফোরিত মেঘ থেকে জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি।

দাদু দরজা খুলে দিলেন মুখে বিরক্তি নিয়ে।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এখানে কেরোসিন পাওয়া যায় না। বাতিটাতি বেশি জ্বেলল না। রাতেও কি ওবাড়ি খাবে?

আমি সামান্য একটু ভিজেছি। রুমালে মাথা মুছতে মুছতে বললাম, এখন তো সবে সন্ধে। দেখা যাক।

পারুলের মা এসেছিল। বলে গেল তুমি এলেই যেন পাঠিয়ে দিই।

আচ্ছা। দুপুরে একটু ঘুম হয়েছে?

আমার? না, আমার আর ঘুম কই?

জামাকাপড় পাল্টে আমি চৌকিতে বসি। টিনের চালে বৃষ্টির কান ঝালাপালা শব্দ। এক সময়ে হয়তো এই শব্দ আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন নেই। এখন ভয় করে। মনে হয়, বুঝি সব ভেঙে পড়ে যাবে।

একটু চায়ের জন্য ভিতরটা আঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু দাদুর চায়ের কোনও পাট নেই। পারুলদের বাড়ি গেলে হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিতে বেরোলেই ভিজে যাব।

চুপচাপ শুয়ে চোখ বুজে রইলাম। চোখ বুজতেই অসীমা দিদিমণির মুখটা মনে পড়ল। কীসের এত দুঃখ ভদ্রমহিলার? যে লোকটা ওকে বিয়ে করবে সেই পারিজাতই বা কেমন লোক? শুনেছি, লোকটার মেলা টাকা, অনেক ক্ষমতা! সে কেন একে বিয়ে করতে চায়?

হঠাৎ চড়াক করে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ভিটে কিনতে যে লোকটা এসেছিল সেনা পারিজাতবাবুরই লোক।

আমি উঠে দাদুর ঘরে গেলাম।

দাদু একটা কাঁথা চাপা দিয়ে বসে আছেন। ঘরটা অন্ধকার। একটা সরু মোম জ্বলছে কুলুঙ্গিতে। সেই আলোয় দাদু একটা কাগজের পুরিয়া খুলে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন মন দিয়ে।

আচ্ছা দাদু, এই জমিটা যে কিনতে চায় তার নাম পারিজাত না?

হ্যাঁ। কেন?

লোকটা শিবপ্রসাদ স্কুলের সেক্রেটারি।

তা হবে।

সেই স্কুলেই আমার চাকরি হওয়ার কথা চলছে।

দাদু তার পুরিয়া থেকে চোখ না তুলেই বলেন, তাই নাকি? চাকরি কি হয়ে গেছে?

না, কথা চলছে।

দাদু পুরিয়াটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, আগের দিনে আর কোনও চাকরি না হোক মাস্টারিটা পাওয়া যেত। আজকাল শুনি, মাস্টারি পেতেও নাকি অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তুমি কি জমিটা ওকে বেচবে বলে কথা দিয়েছ?

না। তুমিই তো বিকেলে বলে গেলে, এখানে থেকে মাস্টারি করতে তোমার সুবিধে হবে।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলি, বলেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে, পারিজাতবাবুই সেক্রেটারি।

দাদু পুরিয়া থেকে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাতে তফাতটা কী হল?

ভাবছিলাম পারিজাতবাবুর সঙ্গে একটা ডিল করা যায় কি না।

কীসের ডিল?

ধরো যদি বলা যায় যে, জমিটা তুমি ওঁকেই বেচবে যদি চাকরিটা আমার হয়।

দাদুর চোখে মোমবাতির আলোতেও সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলাম। বললেন, তাতে আমার লাভ কী? তোমাকে চাকরি দিলে ও কি বাজার-দরে জমি কিনবে ভেবেছ? এক মোচড়ে দাম অর্ধেকে নামিয়ে দেবে।

তা বটে। আমি হতাশ গলায় বলি।

পারিজাতকে তুমি চেনো না। বরং কাউকে মুরুব্বি ধরো।

ধরাধরি করতে পারব না। তার চেয়ে বিজনেস ডিল করা অনেক সম্মানজনক।

মাইনে কত দেবে খোঁজ করেছ?

না। তবে আজকাল মাস্টারির মাইনে খারাপ নয়।

কত শুনি।

সাত-আটশো হবে।

দাদু চোখ কপালে তুলে বলেন, বলো কী। মাস্টাররা তো তা হলে জাতে উঠে গেছে।

তা উঠেছে। কিন্তু টাকার দাম পড়ে গেছে দাদু।

দাদু একটু চুপ করে থেকে গালের হরতুকি মাড়িতে চিবোলেন। লালায় অনেকক্ষণ ভিজে হরতুকিটার এতক্ষণে কাদার মতো নরম হয়ে যাওয়ার কথা। চিবোতে চিবোতে বললেন, জমি বেচলে তোমার চাকরি হবে। এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা। চাকরি না হয় হল, কিন্তু আমি থাকব কোথায়?

বাসা ভাড়া নেব।

ফের ভাড়া বাসা? জন্মে ভাড়াটে থাকিনি বাপু, এই শেষ বয়সে পারব না।

ওরা তো বলেছে, আপনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন ঘরটুকু আর কুয়োতলা নেবে না।

সেটা কথার কথা। একবার রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে তখন কে কার কড়ি ধারে? লোক-লস্কর নিয়ে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে বের করে দিলেই বা মারে কে?

লোকটা কি খারাপ নাকি?

ভাল লোক আর কোথায় পাবে একালে? সব পাজি।

আমি একটু দমে গেলাম। বললাম, চাকরি একটা আমার দরকার দাদু। বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ।

খারাপ তো হবেই। পেটের ভাতের যোগাড় রেখে তার পরই বাবুগিরি করতে তোমাদের কলকাতায় যাওয়া উচিত ছিল। তা তো করলে না। আমি একা মানুষ, জমি-জিরেত সামলাতে পারলাম না। লোকবল থাকলে আজ খেতের ধান কটা গোলায় ভোলা যেত।

পুরনো তর্ক। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে একসময়ে আমি একটা উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে একটা জিনিস শিখেছি। ভূমির সঙ্গে, কর্ষণের সঙ্গে যে-মানুষের গভীর সংযোগ নেই সে কখনও দেশকে ভালবাসতে পারে না।

মউডুবিকে এখন আর গ্রাম বলা ঠিক হবে না। শহরের কাছ-ঘেঁষা গঞ্জ। কিন্তু আমি এমন এমন লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম দেখেছি যেখানে পানীয় জল নেই, ডাক্তার ওষুধ হেলথ সেন্টার নেই, রাস্তা নেই, খাবার নেই। কিছু লোক ধুকছে আর ধুকছে। অথচ, গোটা দেশটারই শক্তির উৎস ওই গ্রাম, ওইসব কৃষিক্ষেত্র ও গোচারণভূমি। কিন্তু এই আজব রাজনীতির দেশের শাসকরা যে ডালে বসে আছে সেই ডালটিই বে-খেয়ালে কেটে ফেলছে।

আমি আর দেশোদ্ধারের কথা ভাবি না। এখন আমার সম্মানজনক শর্তে একটা চাকরি চাই।

কড়ে আঙুলের চেয়েও সরু এবং মাত্র দুআঙুল লম্বা একটা মোম আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, জ্বেলে নাও গে। বর্ষার দিন, পোকামাকড় ঘরে ঢোকে। একটু দেখেশুনে নিয়ে ঘরখানা। কেউ থাকে না, সাপখোপ বাসা করেছে কি না তাই বা কে জানে!

ঘরে এসে মোমটা না জ্বালিয়ে আমি অন্ধকারেই বসে রইলাম। বাইরের মাঠে জল জমে গেছে, বৃষ্টির শব্দ থেকেই বুঝতে পারছি। প্রবল স্বরে ব্যাং ডাকছে। রাত সাড়ে নটার দিকে বৃষ্টি থেমে গেল এবং গণেশকাকা লণ্ঠন হাতে আমাকে নিতে এলেন।

চল, তোর মাসি ভাত নিয়ে বসে আছে।

আমি একটু রাগ করে বললাম, রোজ কি দুবেলাই ওবাড়ি পাত পাড়তে হবে নাকি?

সে তোর মাসির সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

জল ভেঙে ছপ ছপ করে হাঁটতে হাঁটতে গণেশকাকা মৃদু স্বরে বললেন, একটা খবর আছে।

কী খবর?

দোকান থেকে আসবার সময় অসীমা দিদিমণির বাড়ি হয়ে এলাম।

আবার গেলেন কেন?

সন্ধেবেলায় যে দুজনে কথা হয় রোজ।

কাদের কথা হয়?

অসীমা দিদিমণি আর পারিজাতবাবুর।

ও আমাকে নিয়েও কথা হয়েছে নাকি?

হয়েছে। তবে জহরবাবুর মেয়ে প্রতিমাও ওই পোস্টের একজন ক্যানডিস্টে। প্রতিমাকেই প্রায় সিলেক্ট করে রেখেছিলেন পারিজাতবাবু। অসীম দিদিমণি তোর কথা বলাতে উনি ভেবে দেখবেন বলেছেন।

তা হলে ভেবে দেখতে থাকুন।

তোকে কাল একবার পারিজাতকার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

জহরুবাব কে?

তুই চিনবি না।

খুব নিডি লোক নাকি?

নিডি কে নয় এই বাজারে? যার লাখ টাকা আছে সেও ঘ্যান ঘ্যান করে।

জহরবাবু কি সে ধরনের লোক।

তা বলছি না। ছা-পোষা লোকই। সামান্য মাস-মাইনে, গোটা চারেক মেয়ে।

তা হলে তো মেয়ের চাকরিটা ওঁর দরকার।

তা বটে, তবে তোর দরকার আরও বেশি।

সেও ঠিক কথা। তবু আমি বলব, জহুকুর মেয়ের চাকরি হওয়াটা যদি বেশি দরকার বলে মনে করেন তবে আমি সরে দাঁড়ব।

তোকে বেশি পাকামি করতে হবে না তো।

আমি চুপ করে গেলাম।

.

সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সকালবেলাটাও মেঘল, ম্লান, নিস্তেজ। তবে বৃষ্টি নেই। জলকাদায় রাস্তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। সেই অদৃশ্য রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে শহরে চলেছি। পদে পদে সাইকেল গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠছে। হ্যান্ডেল বেঁকে যা একিলিক। কয়েক জায়গায় রাস্তার ওপর দিয়ে তোড়ে বয়ে যাচ্ছে জল। এত জল কোথা থেকে তো ঠিক বুঝতে পারছি না। রাস্তার দুদিকে মাটি প্রায় দেখাই যাচ্ছেনা। জলে জলময়।

বড় একটা গর্তে পড়ে সাইকেল কাত হয়ে গেল। ঝপ করে আমার পা পড়ল হাঁটুভর ঘোলা জলে। জু রাস্তা আর দূরে নয়। জলে সাইকেল চালানোর ঝুঁকি না নিয়ে আমি সাইকেল ঠেলে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়লাম। দরমার বেড়ওয়ালা দোকানগুলো খুব অল্পই আজ খুলেছে। অন্তত দুটো দোকান মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিছু লোক পোটলা-পুঁটলি নিয়ে জড়ো হয়েছে বড় রাস্তার ওপর। দূরে আরও কিছু লোককে জল ভেঙে মার ওপর দিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। তাদের মাথায় বাক্স-প্যাটরা।

বৃষ্টিটা এবার বেশ জোরালো। আমাদের উঠোন কাল রাত থেকেই জলে ডুবে আছে। সামনের বাগানটুকুতেও ঘাস দেখা যাচ্ছে না।

গণেশকাকার দোকানে পৌঁছোতেই উনি বললেন, দিদিমণির আজ শরীরটা ভাল নেই। খবর পাঠিয়েছেন। তুই একা গিয়ে পারিজাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবি না?

আমি একটু হেসে বললাম, পারব না কেন? লোকটা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয়।

গণেকাকা একটা ভাজকরা কাগজ পকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই হাতচিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন অসীমা দিদিমণি। এটা নিয়ে পারিজাতবাবুর হাতে দিস। সিহীৰুদের বাড়ি, চিনিস তো?

চিনি। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যাস।

সিংহীবাবুদের বাড়ি আমি শুধু চিনিই নয়, ওবাড়ির একটি ছেলে সুশীলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। পুরো সামন্ততান্ত্রিক পরিবার। এক সময়ে খুবই বড় অবস্থা ছিল। আমরা জ্ঞানবয়সে যখন সিহবাবুদের বাগানে ফল পাড়তে যেতাম তখনই টের পেতাম ওদের অবস্থা পড়তির দিকে। বাড়িতে কলি ফেরানো হয় না, বাগানের শ্রীছদ নেই, চাকরবাকরের সংখ্যা কমে আসছে এবং সিংহীবাড়ির বাবুরা রিক্সা-টিক্সাতেও চড়ছে। আগে ওদের গাড়িটাড়ি ছিল। মস্ত এই বাড়িটার মেরামত এবং রক্ষার খরচ ওরা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। সামন্তদের হটিয়ে অর্থনীতি নিজেদের হাতে নিতে তখন এগিয়ে আসছে নয়া পুঁজিপতিরা। এরা ব্যবসায়ী, ঠিকাদার বা ছোটখাটো শিল্পপতি। সামন্তরা সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধরনটা বুঝতে পারেনি। আলস্য, আত্মসুখ ও পরিবেশ-উদাসীন হওয়ায় তাদের পতন অনিবার্য ছিলই। একদল শোষণকারীর হাত থেকে অর্থনীতি গেল অন্য একদল শোষ্ণণকারীর হাতে।

সিংহীবাবুদের বাড়ি এখন পারিজাতবাবু কিনে নিয়েছে। নেওয়াটাই স্বাভাবিক। যতদূর জানি পারিজাতবাবু নয়া ধনতন্ত্রের শরিক। তিনি সিংহী ম্যানসন কেনায় বোধহয় সিংহীবাবুরাও বেঁচেছে। অতবড় জগদল বাড়িটা ছিল তাদের বুকে জগদ্দল এক ভারের মতো।

আমি আশা করেছিলাম নয়া ধনতন্ত্রের এই প্রতিনিধি সিংহীবাড়িকে আবার নতুন করে ঘষে মেজে চকচকে করে তুলেছেন। কিন্তু তা নয়। অবাক হয়ে দেখি বাড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে। বাগান আগাছায় ভর্তি। বাড়ির কলি ফেরানো হয়নি। ফাটা ভাঙা অংশগুলি যেমনকে তেমন রয়ে গেছে। ফটক হা হা করছে খোলা।

ভিতরে মোরামের রাস্তায় পড়তেই ভিতর থেকে দুটো অভিজাত কুকুরের গমগমে ডাক শুনতে পেলাম। একটু ভয় হল, ছাড় নেই তো কুকুর দুটো?

রাস্তার ওপরে এসে পড়েছে কাঞ্চন গাছের শাখাপ্রশাখা। সাদা ফুলে ফেঁপে আছে গাছটা। রাস্তার দুধারে ফুলের কিছু গাছ নজরে পড়ল। ফটক খোলা, গরু ছাগল ঢুকে যেয়ে যেতে পারে তো। নাকি বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে গরু ছাগলও ভয় পায় আজকাল?

গাড়িবারান্দার তলায় সাইকেল থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না। শুধু ভিতরবাড়িতে কুকুরের গমগমে গলা আর একবার শোনা গেল।

বড়লোকদের মুখোমুখি হতে আমার কোনও অস্বস্তি কাজ করে না। কারণ আমি এ দেশের বড়লোকদের আকণ্ঠ ঘৃণা করি। একটু নেড়েচেড়ে দেখার জন্য পারিজাতবাবু যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন এতে আমি মজাই পাচ্ছি। আমি ওর সামনে অবশ্যই ভাল মানুষ সেজে থাকা এবং শিক্ষকোচিত গুড়ি গুডি আচরণ করব। কিন্তু লোকটা জানবেও না, আমাকে চাকরি দেওয়া মানে নিজের চেয়ারের নীচে একটি টাইম বোমা স্থাপন করা। চাকরি পেলে আমি ধৈর্য ধরে কনফার্মেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর তারপর আমার যাবতীয় শানানো ঘৃণা ও আক্রোশ নানা আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়ে ফেটে পড়বে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে গণ্ডগোল চলছে, আমি জানি। কীরকম গণ্ডগোল তা জানি না। আর গণেশকাকার কাছে শুনেছি, পারিজাত লোক ভাল নয়। দাদুও সেই কথাই বলেন। সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মোটামুটি ঠিকই হয়ে গেছে।

সদর দরজায় খানিকক্ষণ কড়া নাড়লাম। দরজা হাট করে খোলা, কিন্তু লোক নেই। আহাম্মকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা দোলনা ছিল। লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো শেকলের দোলনা। ছেলেবেলায় অনেক চড়েছি সেটায়। এখন আর দোলনাটা নেই। পাথরে তৈরি একটা ছোট্ট ফোয়ারা ছিল গাড়িবারান্দার সামনেই। সেটা আছে বটে, কিন্তু গতানো গাছে এমন ঢেকে গেছে যে, বোঝাই যায় না। উত্তর দিকে একটা কাশীর পেয়ারাগাছ ছিল। কিন্তু বারান্দা থেকে বোঝা গেল না, গাছটা আছে কি নেই। কারণ ওদিকটায় আরও বড় বড় গাছ কয়েকটা হয়েছে।

যুবকের মতো খানিকক্ষণ হা করে এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পিছনে একটা মৃদু চটির শব্দে মুখ ঘোরালাম। খুব চমকিলি চেহারার একটা মেয়ে। বেশ চটক আছে চেহারায়, যেমনটা বড়লোকদের থাকেই। জন্মগত চেহারা তেমন দেখনসই না হলেও বড়লোকের মেয়েরা সেটাকেই মেজে ঘসে কতটা সুন্দর করে তুলতে পারে।

মেয়েটা আমার দিকে খুব ভ্রু কুঁচকে এবং অবহেলার দৃষ্টিতে তাকাল বলে আমার মনে হল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। বারান্দা পর্যন্ত এলও না মেয়েটা। বাইরের হলঘর থেকে ডানহাতি আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি একটু বেশি সকালে পৌঁছে গেছি। আর একটু পরে আসাই বোধহয় উচিত ছিল। কিন্তু এরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও আমার ভাল লাগার কথা নয়।

আমি সোজা হলঘরে ঢুকে পড়লাম এবং মেয়েটা যে ঘরে ঢুকেছে সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, শুনছেন?

মেয়েটা একটা ডেসকের ড্রয়ার খুলে নিচু হয়ে কিছু একটা দেখছিল। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দাদা এখনও ফেরেনি। বারান্দায় বেঞ্চ আছে, অপেক্ষা করুন।

আমার একটু রাগ হল। তা গরিবদের তো চট করে রাগ হয়েই থাকে। সেটা চাপা দিয়ে বললাম, উনি কোথায় গেছেন?

মর্নিং ওয়াক করতে।

কখন ফিরবেন তার কি কোনও ঠিক নেই?

আমি অত জানি না। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মেয়েটার কথাবার্তা অভদ্র, আচরণে অহংকার। আমি বললাম, দারোয়ানকে তো দেখলাম না।

আছে। খুঁজে দেখুন।

মেয়েটা যা খুঁজছিল তা বোধহয় পেয়ে গেল। সটান এগিয়ে এসে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটা বেশ সুগন্ধ পেলাম তার গা থেকে। নাভির নীচে পরা শাড়ি, খুব সংক্ষিপ্ত ব্লাউজে মেয়েটিকে বেশ দেখাল। আমাকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল বটে, কিন্তু বউনিটা খুব খারাপ হয়েছে বলে মনে হল না আমার। সকালবেলাতেই একটা সুন্দর মুখ বা একটা সুন্দর ফিগার দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

ভিতরে ভিতরে সবসময়ে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে বলেই বোধহয় আমি আজকাল মেয়েদের নিয়ে বেশি কল্পনা করি না। পারুলের সঙ্গে একটা প্রেম-ট্রেম ঘটেনি আমার। প্রেম-ট্রেম করেও তো লাভ নেই। বেকার মানুষ, বাড়িতে হাঁড়ির হাল, সুতরাং একটা মেয়েকে তুলে আনতে তাকেও কষ্ট দেওয়া, নিজেরাও কষ্ট পাওয়া। তবে প্রেম না করলেও কোনও মেয়ে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে আজও মন খিঁচড়ে যায়। বহুদিন বাদে এই মেয়েটা আমার মনে একটা খিচ ধরাল। তবু বউনিটা খারাপ হয়নি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িবারান্দার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা আমার সাইকেলের বেলটা ক্রিং ক্রিং করে বাজাতে লাগলাম। এভাবে যদি খানিকটা ডিসটার্ব করা যায় এদের এক নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়া যায়।

কাজ হল। সিংহীদের বাগানে কয়েকটা কুঞ্জবন আছে। তার ভিতরে লোহার বেঞ্চি পাতা বড়লোকদের কত খেয়ালই না থাকে। এরকমই একটা কুঞ্জবন থেকে হঠাৎ খাকি পোশাক পর একটা লোক বেরিয়ে আমার দিকে আসতে লাগল।

লোকটা দারোয়ান সন্দেহ নেই। বুঝলাম, পারিজাতবাবুর বাগানে গোরু ছাগল ঢোকে না কেন প্রকাশ্যে দারোয়ান না থাকলেও আড়ালে বসে নজরদারি করার লোক ঠিকই আছে।

লোকটা আমার কাছে এসে বলল, কাকে চাইছেন?

পারিজাতবাবু কোথায়?

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, উনি এখন জগিং করছেন। আপনি একটু পরে আসুন।

কখন আসবেন তার কিছু ঠিক আছে?

উনি বাগানেই জগিং করছেন।

এই বাগানেই?

হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখা হবে না।

দারোয়ানরা যদিও আমার প্রায় সমশ্রেণির লোক বু কেন জানি এই শ্রেণিটাকে আমি পছন্দ করি না। দারোয়ান মানেই তো বড়লোকের ধনমানের প্রহরী। তার মানে কর্তাভজা। মালিক হাসলে এরাও হাসে, মালিক গম্ভীর হলে এদের মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, উনি আমার আত্মীয়।

লোকটা খুব ইমপ্রেসড হল না। বড়লোকদের গরিব আত্মীয় থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের বেশি লাই দেওয়ার নিয়ম নেই। আমার আকার এবং প্রকার লোকটার পছন্দও হচ্ছিল না। বলল, অপেক্ষা করুন। উনি এসে যাবেন।

লোকটা আবার কুঞ্জবনে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল।

সিংহীদের বাগানটা বিরাট। হেসেখেলে বিচারেকহবে। আমি পায়ে পায়ে ঘাসজমি ধরে হটতে লাগলাম।

প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল, সিংহীদের বাগান বা বাড়ির কোনওরকম সংস্কারই বুঝি পারিজাতবাবু করেননি। কিন্তু তা ঠিক নয়। অন্তত একটা সংস্কার তিনি করেছেন। সংস্কার কিংবা সংযোজন। বাগানের চারধারে পাঁচিল ঘেঁষে একটা সরু মোরামের রাস্তা তিনি বানিয়েছেন। সম্ভবত জগিং করার জন্যই।

ধৈর্য ধরে সেই মোরামের রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই লোকটাকে দেখা গেল। পিছনের পুকুরের ধারে কলাকোপের পাশ দিয়ে বাঁকু নিয়ে লোকটা এগিয়ে আসছিল। সাদা হাফ প্যান্ট আর তোয়ালের গেঞ্জি পরা, পায়ে কেডস। কেশ পাকানো শক্ত চেহারা। সন্দেহ নেই লোকটা স্বাস্থ্যসচেন। তা হবে নাই বা কেন? দেদার টাকা, দেদার ভোগ্যবস্তু, দেদার স্তাবক। এত সব ভোগ করতে হলে স্বাস্থ্য তো চাই-ই।

লোকটা কাছাকাছি আসতেই আমি মোরামের রাস্তায় উঠে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ আটকালাম।

কিন্তু লোকটা ভারী একয়ে। দাড়িয়াবা খেলার খেলুড়ির মতো সাঁ করে আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল এবং হাফধরা গলায় পেঁচাল, চলে আসুন। রান বয়, রান।

বুঝলাম এই স্বাস্থ্য-পাগল, দৌড়-মাতাল লোকটাকেনাগালে পেতে হলে ওটাই একমাত্র উপায়। কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। বোধহয় সেটা সাময়িক পাগলামিই। আমি লোটার পিছু পিছু দৌড়তে লাগলাম।

অবশ্য জগিং জিনিসটা ঠিক দৌড় নয়। দৌড় একহটার মাঝামাঝি। দৌড়-পায়ে হাঁটা আর কি।

লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম?

অভিজিৎ গাঙ্গুলি।

কী দরকার?

ইস্কুলের অঙ্কের ভেকেলিটার জন্য অসীমা দিদিমণি আমাকে পাঠিয়েছেন।

ও হোঃ, তুমিই অসীমার লোক তা হলে?

হ্যাঁ।

অসীমা বলেছিল আমাকে। মাস্টারি করতে চাও কেন?

চাকরি দরকার তাই।

এই অল্প বয়সে মাস্টারি করতে ভাল লাগবে।

আর কী করব?

মাস্টারির চাকরিতে অ্যাডভেঞ্চার নেই, থ্রিল নেই, টাকা নেই।

জানি।

অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না?

আর কী?

বিপ্লব করো, তছনছ করো, ওলটপালট করে দাও সব কিছু।

স্কোপ নেই। পুলিশে ধরবে।

ধরুক না। সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা।

আমার বাড়িতে বড় অভাব।

কীরকম অভাব?

খুব অভাব।

ভাতের বদলে কখনও আটাগোলা খেয়েছ?

না তো?

ঘাস খেয়েছ কখনও?

না।

মেটে আলু খেতে কীরকম হয় জানো?

না।

কাপড় নেই বলে কোনওদিন গায়ে মাদুর জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছে?

না।

খড়ের বিছানায় শুয়েছ কখনও?

না।

তা হলে কেমন অভাব তোমাদের?

এ ছাড়াও তো অভাব আছে।

তুমি দারিদ্র্যের স্বরূপই এখনও দেখোনি।

আপনি দেখেছেন?

আমি দারিদ্র্যসীমার ওপারের লোক। এক্কেরের শেকড়ের কাছাকাছি থেকে উঠে আসতে হয়েছে। বড় কষ্ট।

আপনি হাঁফাচ্ছেন। এবার থামুন।

আরও দুরাউন্ড। তারপর থাম। ভেবো না আমি হাঁফিয়ে পড়েছি।

কিন্তু আপনি তো হাঁকাচ্ছেন।

ওটা কিছু নয়। দৌড়োতে তোমার কেমন লাগে?

ভাল নয়। আমি বহুকাল দৌড়োইনি।

আর আমি চিরটাকাল কেবল দৌড়োচ্ছি।

তাই নাকি? দৌড়োচ্ছন কেন?

দৌড়ে আসলে পালাচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পালাচ্ছেন কেন?

পালাচ্ছি দারিদ্র্য থেকে, ক্ষুদ্রতা থেকে। রানিং বিয়ন্ড টাইম, বিয়ন্ড পভারটি, বিয়ন্ড এভরিবডি এলস। বুঝলে?

না, ভাল বুঝলাম না।

তুমি যথেষ্ট গরিব নও। যথার্থ গরিবও নও। হলে বুঝতে।

পালানোই কি গরিবের ধর্ম?

গরিবদের কোনও ধর্ম নেই, কোনও নিয়ম নেই। কেউ পালায়, কেউ নেতিয়ে পড়ে থাকে, কেউ রুখে উঠতে চায়।

সুন্দর একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় এসে পড়িআমরা। বন্য একটি গোলাপ গাছের ডাল আমার জামা টেনে ধরে এবং ছেড়ে দেয়। লোকটাকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, আপনি কি পলাতক।

লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আর একবার আমাকে দেখে বলল, সামনে একটা নালা আছে। সাবধান।

নালাটা আমরা দুজনেই সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করার পর লোকটা বলে, আমি দৌড়োতে ভালবাসি। ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে, দৌড়োতে দৌড়োতে নিজেকেও ছাড়িয়ে যাই। বুঝলে?

না। এসব বোধহয় দার্শনিক কথাবার্তা!

লোকটা উদাস গলায় বলল, তা বলতে পারো। দানিকতা তোমার ভাল লাগে না?

লাগে। তবে উদ্ভট দার্শনিকতা নয়।

উদ্ভট হবে কেন? বরং খুব সাধারণ দার্শনিকতা।

কীরকম?

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানে গ্রেট সাকসেসেস অ্যান্ড গ্রেটার সাকসেসেস। নিজের যতটা সামর্থ্য আছে বলে তুমি ভাবো তার চেয়েও ঢের বেশি সামর্থ্য অর্জন করতে থাকাই হচ্ছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

আমি খুব সাবধানে একটা ফুলগাছের কাঁটাওলা ডাল এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললাম, তাও বুঝলাম না।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দকরল। হাঁফাতে হাঁফাতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া খুব শক্ত কাজ। কেননা হাঁফানোর সময় সবকটা শসই দীর্ঘ হতে বাধ্য। কিন্তু লোকটা তার মধ্যেও একটা দীর্ঘতর শ্বাসের শব্দ কী করে বের করল সেইটেই রহস্য।

আমরা একটা পুকুরের ধার ধরে দৌড়াচ্ছি। চমৎকার করুন। মেলা টেকিশাক হয়ে আছে। জলের কাছ ঘেঁষে কলমির জঙ্গল। জলে শাপলাফুল। বাঁধানো ঘাট শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। বর্ষার জল কোথাও কোথাও পুকুরের পাড় উপচে যোরামের রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে। লোকটা এবং আমি তার ওপর দিয়ে ছপ ছপ করে দৌড়োতে থাকি।

দৌড়োতে দৌড়োতে লোকটা বলে, পোস্টটার জন্য আর একজন ক্যান্ডিডেট আছে। তোমার কোয়ালিফিকেশন কী?

বি এসসি অনার্স।

মেয়েটারও বোধহয় তাই। তবে সে আবার বি এড

বি এড হওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই নাকি? বলে লোকটা ফের ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একটু দেখে নিয়ে বলে, পৃথিবীর কোন কাজটা তোমার কাছে সবচেয়ে শক্ত মনে হয়?

বেঁচে থাকা।

তুমিও তো দেখছি দার্শনিক কিছু কম নও।

এটা দর্শন-টর্শন নয়। বেঁচে থাকাটাই ভারী শক্ত, বিশেষত আমাদের মতো গরিবদের পক্ষে।

কিন্তু আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি জেনুইন গরিব নও।

লোকটাকে পেছন থেকে ল্যাং মারার আর একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, কীরকম গরিব আপনার পছন্দ?

গরিবদের আমি পছন্দ করি কে বলল?

করেন না?

তাও বলছি না। তবে একটা লোক গরিব বলেই তাকে পছন্দ করতে হবে এমন কোনও শর্ত আমি মানি না। গরিব হওয়া খুব খারাপ।

আমার হাত পা রাগে একটু নিশপিশ করে উঠল। বললাম, আপনিও তো একদিন গরিব ছিলেন করে। তাদের প্রতি আপনার সিমপ্যাথি থাকা উচিত।

লোকটা কলাগাছের ঝোপটা ডাইনে ফেলে এগোতে এগোতে বলল, আমি গরিব অবস্থায় চোর, মিথ্যাবাদী, নিমকহারাম, পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ ছিলাম।

আমার একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, এখনও কি তাই নন? চেপে গেলাম।

কি আশ্চর্য, লোকটা নিজেই বলল, হয়তো এখনও আমি তাই-ই আছি। তবে এসব দোষের উৎস এই দারিদ্র্য।

আমি বললাম, বড়লোকেরা আরও বেশি মিথ্যেবাদী, আরও বড় চোর, আরও পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ হয়।

এটাই শেষ রাউন্ড, বুঝলে। এই রাউন্ডে আমি একটু জোরে দৌড়োই।

আমি ধৈর্য হারিয়ে বলি, আপনি রাউন্ডটা শেষ করুন, আমি বরং গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আর, না না। তুমি তো জানো না দূরপাল্লার দৌড়বাজরা কীরকম নিঃসঙ্গ আর একা। তাদের আনন্দ নেই, উপভোগ নেই, বিশ্রাম নেই, বন্ধু নেই, প্রেম নেই, আছে শুধু দৌড় আর দৌড়।

আপনি এত দৌড়ন কেন? অলিম্পিক যাবেন নাকি?

দূর বোকা ছেলে। দৌড়ের অর্থ এখানে অন্য। আমি যে জীবনযাপন করি সেটাই এক দূরপাল্লার দৌড়।

তা না হয় হল, কিন্তু আনন্দ, বিশ্রাম, বন্ধু বা প্রেম নেই কেন?

খসে পড়ে যে। যতই তুমি দৌড়োতে থাকবে ততই ওসব খসে পড়তে থাকবে। কোনও কিছুই রেসঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে না। ক্রমে তুমি একা হয়ে যাবে, ভীষণ একা। ভারী ক্লান্ত বোধ হবে, কিন্তু থামলে চলবে না।

ও, ফের সেই দার্শনিকতা।

লোকটা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল।

ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ। শেষ দুটো রাউন্ড আমাকে সঙ্গ দিয়েছ বলে।

আজকাল চাকরির জন্য লোকে সব কিছু করতে পারে।

সামান্য একটা মাস্টারির জন্য?

মাস্টারি আপনার কাছে সামান্য মনে হলেও, আমার কাছে অসামান্য।

আমার এক সময়ে মনে হত আখের গুড়ের চেয়ে ভাল খাদ্য বুঝি আর কিছু নেই। এসো, এবার একটু জোরে দৌড়েই।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি গোঁয়ার লোকটার সঙ্গে প্রায় সমান তালে দৌড়োত লাগলাম। হ্যাঁ, লোকটা গোঁয়ার, একরোখা, খ্যাপাটে, নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। এ লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগছিল না।

শেষ রাউন্ডটা জোরে দৌড়োতে হল বলে লোকটার দমে টান পড়েছিল বোধহয়। বেশি কথাটথা বললনা। দমে আমারও টান পড়েছিল। লোকটা কথা না বলায় বাঁচলাম।

ঘেমে হেদিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে যখন দুজনে গাড়ি বারান্দার তলায় পৌঁছোলাম তখন দেখি বারান্দায় একজন ভদ্রলোক ও একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রলোক বিগলিত হাসি হেসে বলল, সকালে উঠে দৌড়োনো খুব ভাল অভ্যাস। সেই জন্যই না আপমার স্বাস্থ্যটি এমন ডগমগে।

লোকটা হাঁফাতে হাফাতেই আমাকে চোখ টিপে চাপা গলায় বলল, এসে গেছে। কমপিটিটার।

মেয়েদের দিকে তাকানোর কোনও মানেই আজকাল আর আমি খুঁজে পাই না। তবে অভ্যাসবশে তাকাই। গোৰু কি পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করে? যতদূর জানি করে না। তবে তাকায়, আমিও আজকাল গোরুর মতো নির্বিকার চোখে মেয়েদের দেখি।

তবে লোকটা কমপিটিটার বলায় আমি গোরুর চেয়ে আর একটু তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকালাম।

আগের দিনে গল্প উপন্যাসে নায়িকা বা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনার একটা রীতি ছিল। আর তাতে কী বাড়াবাড়িই না থাকত! আজও পৃথিবীতে মেয়েদের রূপ একটা মস্ত বড় আলোচ্য বিষয়। এ থেকেই বোঝা যায়, মেয়েদের অস্তিত্বটা এখনও অনেকটাই শরীরকেন্দ্রিক। তাদের অন্যবিধ গুণাবলীকে এখনও পুরুষশাসিত সমাজ তেমন আমল দিচ্ছে না। তা এই মেয়েটির রূপ তেমন কিছু নয়। ফ্যালনাও বলছি না। একটু শ্যামলা ঘেঁষা রং। মুখখানায় লাবণ্য আছে। বেশ লেঢলে মাঝারি গড়ন, মাঝারি দৈর্ঘ্য। পরনে একটা সবুজ ডুরে শাড়ি। গলায় বড় বড় লাল পাথরে মালা, ফুল, কপালে টিপ। হাতে দু গাছা বালা। সাজপোশাক থেকেই মনে হয়, তেমন আধুনিক করে নয়। মুখ-চোখও ভারী লাজুক আর সপ্রতিভ। একটু ভয়-ভয় ভাবও আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকাল। এইসব মেয়ের কাছে অপরিচিত যুবা মানেই সম্ভাব্য ধাকারী বা মহিলালোভী পেশাদার প্রেমিক।

লোকটা হাফাতে হাফাতেই বলল, আরে সাতসকালেই জহরবাবু যে!

প্রতিমাকে নিয়ে এলাম। আপনি বলেছিলেন একবার নিয়ে আসতে।

ভালই করেছেন। ঘরে গিয়ে বন। আমি ধরাচূড়া ছেড়ে আসছি। বলেই লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বলল, তুমিও যাও। কমপিটিটারটিকে ভাল করে মাপজোক করে দেখো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা দৌড়োত দৌড়োতে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

না, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি পারিজাত নামক এই ধনতান্ত্রিক, শ্রেণিশত্রু শোষক ও উচ্চাভিলাষী লোকটিকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। লোকটি পাজি সন্দেহ

নেই। শয়তান তো বটেই। অসাধুও নিশ্চয়ই। তবু লোকটার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দন টের পাওয়া যায়।

জহরবাবু হাত কচলে বললেন, আপনি কি ওঁর কেউ হন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। দেখে মনে হল খুব ঘনিষ্ঠ।

আমিও যে চাকরিটার একজন উমেদার সেটা ওঁকে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে একটু দোনোমোনো করলাম। তবে লুকিয়ে লাভও নেই। বলে দিলেই বরং ল্যাঠা চুকে যায়। তাই একটু হেসে বললাম, প্রাতঃভ্রমণ করছিলাম না। দৌড়োতে দৌড়োতে উনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

বলেন কী! কীসের ইন্টারভিউ?

শিবপ্রসাদ স্কুলে অঙ্কের মাস্টারির।

ওঃ। বলে বিনীত, অমায়িক ও হাস্যময় জহরবাবু সহসা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমিও চাকরির ক্যান্ডিডেট জেনে প্রতিমা চকিতে আমার দিকে একটু দৃকপাত করল। সুযোগ পেলে সেও হয়তো তার এই কমপিটিটারকে একটু মাপজোক করত, কিন্তু জহরবাবু মেয়েকে সেই সুযোগ দিলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত মুখে তিনি মেয়েকে চল, চল, বসিগে। যত সব উটকো ঝামেলা... বলে প্রায় হাত ধরে টেনে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়লেন। লক্ষ করলাম, জহরবাবু মাকে মাঝে ঘর থেকে খুনির চোখে আমাকে দেখছেন এবং মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নিচু স্বরে একটা জরুরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আলোচ্য বিষয় যে আমি তাতে সন্দেহ নেই।

বিপজ্জনক ঘরটিতে আর ঢুকলাম না। দৌড়োনোর পর আমার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল। আমি সিংহীদের বাগানটায় পায়চারি করতে করতে পাখির ডাক শুনতে লাগলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পর পারিজাত নামল। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, ঠোঁটে একটু বেসুরো শিস। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিচুস্বরে বলল, কমপিটিটারকে দেখলে?

দেখলাম। তবে আলাপ হয়নি।

কী মনে হল? পারবে কমপিটিশনে?

শুধু চোখে দেখেই কি তা বলা যায়?

তা হলে চল। ফেস হার। মুখোমুখি বসে ষ্ট্যাটেজি ঠিক করো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা মজার সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি লোকটাকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে কমপিটিশনে নামতেও আমার রুচিতে বাঁধছে। আমি চাকরিটার উমেদার শুনে ওর বাবা এমন রিঅ্যাক্ট করল যে, পুরো ব্যাপারটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

আমি বিরসমুখে বললাম, হাই কপিটি যে তা বেশ টের পাচ্ছি। তবে সেই কমপিটিশনে আমার নামবার ইচ্ছে নেই। চাকরি আপনি ওকেই দিন।

কেন বলো তো? মেয়েটাকে দেখে কি তোমার মন নরম হয়ে গেছে?

আমি একটু রাগের গলায় বলি, মোটেইনয়। আমি ক্যান্ডিডেট শুনে মেয়েটার বাবা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

লোকটা হাসল। বলল, আরে দূর! তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল। আসলে জহরবাবু খুব সরল লোক। সরল লোকেরা নিজেদের মনের ভাব গোপন করতে পারে না। তোমাকে কী বলেছে?

আমি বললাম, কিছু বলেনি। কিন্তু অপমানজনক ভাবভঙ্গি করেছে।

ওঃ, এই কথা? লোকটা খুব উদারভাবে হেসে বলে, আমি যে সমাজে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেই সমাজে মিনিমাম গালাগালি কী ছিল জানো? শুয়োরের বাচ্চা। লোকের সঙ্গে লোকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত শুয়োরের বাচ্চা দিয়ে। সেই থেকেই অপমান-টপমানের বোধ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। অপমানবোধ থাকা মানেই একটা ঠা, ওটা যত শিগগির চুকিয়ে ফেলতে পারো ততই মঙ্গল।

আমি তো আপনার সমাজে মানুষ হইনি।

সেই জন্যই তো বলছিলাম তুমি যথেষ্ট গরিবনও। এসো, এসো, ছেলেমানুষি কোরো না।

বেশ গম্ভীর মুখে এবং যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে আমি লোকটার পিছু পিছু ঘরে ঢুকি। জহরবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক যেভাবে ক্লাসে মাস্টারমশাই ঢুকলে ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। অবিকল মাস্টারমশাইয়ের গলায় লেকটা জহরবাবুকে বলল, বসুন, বসুন।

জহরবাবু বসলেন। আমার দিকে না তাকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু কৌতূহল যাবে কোথায়? কাজেই মাঝে মাঝে আমার চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার খুনির চোখ। প্রতিমার চোখেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা, সংশয় ও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

জহরবাবু খুব বিগলিত মুখে লোকটাকে বলতে লাগলেন, আপনাকে বহুদিন ধরেই জীবনীটা লিখে ফেলতে বলছি, একদম গা করছেনা।

লোকটা উদাস গলায় বলে, কী হবে লিখে?

জহরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হবে হবে। আমার মতো গরিবরা দেশের সর্বহারারা আপনার জীবনী পড়ে লড়াই করতে শিখবে। আশা পাবে, ভরসা পাবে, শক্তি পাবে।

আমার তো অত সময় নেই।

জহরবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, তা জানি। আর সেইজন্যই প্রতিমাকে নিয়ে এলাম, ওর হাতের লেখা খুবই সুন্দর। গোটা গোটা ছাপার অক্ষরের মতো, বানান-টানান ভুল করে না, লেখেও তাড়াতাড়ি। তাই বলছিলাম, ইস্কুলের কাজটুকু করেই চলে আসবেন। আপনি নিজের জীবনের কথা বলে যানে, ও বসে বসে ডিকটেশন নেবে।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। একটু চাপা গলায় বলল, হাই কমপিটিশন। বিডিং শুরু হয়ে গেছে। বি অ্যালার্ট।

আমি কুঁচকে রইলাম।

লোকটা জহরবাবুর দিকে চেয়ে বলল, জীবনীটা ছাপবে কে?

আমরাই ছাপব, দরকার হলে চাঁদা তুলব।

লোকটা হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কিন্তু একটা মুশকিল আছে। আমি যে সমাজে মানুষ সে সমাজে অনেক নোংরামি, অনেক কলঙ্ক, অনেক লজ্জা। জীবনী লিখতে গেলে সেসব কথাও এসে পড়বে। খুবই খারাপ খারাপ কথা, সেসব লিখতে প্রতিমার মতো ভদ্র এবং যুবতী একটি মেয়ের অসুবিয়ে হবে না?

জহবাবু একটা ঢোক গিলে আমার দিকে তাকালেন। নারদীয় চোখ। যেনবা কথাটা আমিই পারিজাতকে প্রম্পট করেছি। তারপর বললেন, তাতে কী? পারবে। পারবি না প্রতিমা?

প্রতিমা পারবে কি না বোঝা গেল না। বাইরে হঠাৎ আবার তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। প্রতিমা সেই দিকে চেয়ে ছিল।

# ৫. পারিজাত

স্কুলের ঘন্টা শুনলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ছেলেবেলায় একটা অবৈতনিক উদ্বাস্তু বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। সেই স্কুলটার অবস্থা ছিল আমাদেরই মতো, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। পেতলের ঘন্টা কেনার পয়সা ছিল না বলে রেল ইয়ার্ড থেকে কুড়িয়ে আনা একটা লোহার টুকরো আওয়াজ তোলা হত। সে আওয়াজের কোনও জোর ছিল না। স্কুলে বেশিদিন পড়া হয়নি আমার। পরিবেশের অমোঘ নির্দেশে আমরা ক্রমে ক্রমে রাস্তার ছেলে হয়ে যাচ্ছিলাম। পরবর্তীকালে আমার জীবনের গতিকে আমি পরিবর্তিত করি বটে, কিন্তু স্কুলের জন্য আজও আমার বুকে কিছু দীর্ঘশ্বাস সঞ্চিত আছে।

আজ ছুটির দিন বলে শিবপ্রসাদ স্কুলে কোনও ঘণ্টার শব্দ নেই। অবশ্য এই সাতসকালে ঘণ্টা বাজেও না। খুব সম্প্রতি আমি ছুটির দিনে স্কুলটায় আসি এবং কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই বা বসে থাকি।

না, আমি কবি, ভাবুক বা আবেগপ্রবণ লোক নই। আমি যা করি তার পিছনে সর্বদাই অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ কারণ থাকে। ছুটির দিনে শিবপ্রসাদ স্কুলে আমার এই আগমনকে লোকে কী চোখে দেখবে জানি না। কিন্তু কারণটা আমার ব্যক্তিগত।

তটস্থ দারোয়ান ও দফতরিকে হাতের ইশারায় আমার অনুগমন করা থেকে নিবৃত্ত করে আমি প্রকাণ্ড স্কুলটা লম্বা ও প্রায় অন্ত বারান্দা করে বহু দূর পর্যন্ত হাঁটতে থাকি। ক্লাসঘরগুলোর দরজা বন্ধ। ভূতের বাড়ির মতো নিস্তব্ধ পরিবেশ। স্কুলের মাঝখানে মস্ত মাঠ, মাঠের ধারে ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া চমৎকার বাগান। কমলা সেনের রুচি আছে। স্কুলে ঢুকলেই বোঝা যায়, ভারী ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন এর পরিবেশ। দেওয়ালে কোনও লেখা নেই, বারান্দা বা বারান্দার নীচের ঘাসে কোনও নোংরা নেই। থামের ধারে ধারে ময়লা ফেলার বাক্স সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এসব দেখতে আমি আসিনি। ক্লাস ফাইভের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে আমি বিশাল স্কুল বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকি। মাঠের তিন দিক ঘেরা ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো মস্ত দোতলা বাড়ি। আমি এই স্কুলের সেক্রেটারি বটে, কিন্তু স্কুলটার সঙ্গে আমার কোনও ভাবগত যোগাযোগ নেই। আমি এই জায়গার লোক নই, এই স্কুলে কখনও পড়িনি। তাই এই স্কুলকে নিয়ে মামার কোনও সুখস্মৃতি নেই। সম্ভবত এই স্কুল বা পৃথিবীর অন্য কোনও স্কুলের প্রতি আমার তেমন কোনও দুর্বলতা বা ভালবাসাও নেই।

আমার না থাক, অসীমার আছে। আর সেই ভালবাসা কতটা গভীর এবং কতটা একনিষ্ঠ তা আমার জানা দরকার।

অসীমার আচরণের মধ্যে সম্প্রতি আমি কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি। যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের কাছেই পদোন্নতি একটি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বিশেষ করে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হওয়াটা তত যে কোনও শিক্ষয়িত্রীর কাছেই শিকে ছেঁড়ার মতো ঘটনা। এই অত্যন্ত ভাল জাতের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখার কথা। কিন্তু অসীমার মধ্যে সেই দুর্লভ ইচ্ছাপূরণজনিত কোনও আনন্দের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

কমলা সেনকে অসীমা বোধহয় একসময় খুবই শ্রদ্ধা করত এবং ভালও বসত। কিন্তু সম্প্রতি কমলা সেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। না যাওয়ারই কথা। কমলা সেন আমাকে পছন্দ করেন না, আমার ভাবী স্ত্রীকেও তার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তবু এই কমলা সেনের পদত্যাগের কথায় অসীমা যেন তেমন স্বস্তি পাচ্ছে না। তার বদ্ধমূল ধারণা, কমলা চলে গেলে স্কুলের অবনতি ঘটবে। এমনকী সে ধরেই নিয়েছে, তার পক্ষে স্কুলের প্রশাসন ঠিক মতো চালানো সম্ভব নয়।

আমার সমস্যা অসীমাকে নিয়ে। আমি তাকে আর একটু জানতে চাই। আমার ভিতরে যে ক্যালকুলেটর যন্ত্রটি সব সময়েই নির্ভুল নির্দেশ দেয় সে যেন বলছে, অসীমার ভাবগতিক

ভাল নয়। তার ভিতরে একটা বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। যদিও আমার ধারণা সেই অঙ্কুরটি সম্পর্কে অসীমা নিজেও সচেতন নয়।

বস্তুত এই স্কুলে এসে এর পরিবেশটিকে আমি হৃদয়ঙ্গম করারই চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি, অসীমার প্রকৃত মনোভাবটি কী।

চিন্তাটা অবশ্য ঘরে বসেও করা যায়। কিন্তু স্কুলে এলে এমনটা এই পরিবেশে আরও সুনিশ্চিয়তার সঙ্গে তার ক্যালকুলেশন চালাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্লাস ফাইভের সামনে সিঁড়িতে বসে আমি অসীমার শুষ্ক ও রুক্ষ মুখখানা স্পষ্টই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, অসীমা ক্লাসের শেষে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আনমনে বাগানের একটা দোলনচাঁপা গাছের দিকে চেয়ে দেখল একটু। সাদা সুন্দর নিষ্পপ ফুল। তারপর একটু শিউরে উঠল সে। কুসুমে যে কীটও আছে। শিবপ্রসাদ স্কুলের হিসাবনিকাশ অন্তত সেইরকমই একটা আভাস দিচ্ছে। এই শুচিশুভ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটছে নেপথ্যের লোভী হস্তাবলেপ। তার হয়তো সন্দেহ, সে হেডমিস্ট্রেস হওয়ার পর তার ভাবী স্বামী তাকে সামনে শিখণ্ডীর মতো রেখে তলায় তলায় স্কুলের ভিত ক্ষয় করে ফেলবে। কিন্তু তা হতে দেয় কী করে সে? এই স্কুলকে যে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। প্রারম্ভিক প্রার্থনাসংগীত থেকে শেষ পিরিয়ডের ড্রিল পর্যন্ত তার কাছে যেন এক বিশুদ্ধ সংগীতেরই বিস্তার ও পরিণতি।

শিবপ্রসাদ স্কুলের প্রতিটি ইট কমলা সেনের মতোই তার কাছেও বুকের পাঁজর।

চোখ বুজে অসীমার মানসিকতার মধ্যে আমি এমন ডুবে ছিলাম যে আকস্মিক একটা আর্ত চিৎকারে প্রায় লাফিয়ে উঠতে হল।

পরমুহূর্তেই অবশ্য ভুল ভাঙল। চিৎকার নয়, গান। মনে ছিল না যে, রবিবার সকালে এই স্কুলে একটা গানবাজনার স্কুলের ক্লাস হয়।

আমি উঠে পড়লাম, উঠতে উঠতেই সিদ্ধান্ত নিলাম, অসীমার ওপর নজর রাখতে হবে। খুবই সতর্ক নজর রাখতে হবে। তার মানসিকতা এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই।

বেরিয়ে আসবার মুখে ফটকের কাছে একজন তানপুরাধারী লোক আমার পথ আটকাল।

দাদা! আমি হাল ছাড়িনি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। মস্ত বাবরি চুল, গালে মাইকেলের মতো জুলপি, পরনে চুস্ত পায়জামা আর গায়ে দারুণ চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি। একটু ঠাহর করে দেখে তবে গন্ধর্বকে চিনতে হল।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, না গন্ধর্ব, হাল ছাড়াটা ঠিকও হবে না। লেগে থাকো। গান কেমন হচ্ছে?

দারুণ! আজকাল-কথা পর্যন্ত গান হয়ে বেরোতে চায়।

বাঃ! আর নাচ?

দুর্দান্ত। আজকাল আমার হাঁটাচলায় পর্যন্ত নাচের ছন্দ।

তোমার হবে গন্ধর্ব।

আপনার আশীর্বাদ।-বলে গন্ধব আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, রুমার সঙ্গে আসানসোলের একটা ফাংশনে দেখা হয়েছিল।

তাই নাকি? কেমন বুঝলে?

পাত্তা দিচ্ছে না।

একদম না?

না, তবে আড়ে আড়ে দেখছে বলে মনে হল।

তুমিও লক্ষ রেখো, রুমা পাকাল মাছের মতো পিছল মেয়ে।

লক্ষ রাখার সময় কোথায়? খুব ভোরে গলা সাধি। সকালে যোগব্যায়ামের ক্লাসে যাই। দুপুরে কলেজ। বিকেলে জিমনাসিয়াম। সন্ধেবেলায় নাচের প্র্যাকটিস। ঠাসা প্রোগ্রাম।

আমি সভয়ে বলি, তুমি কি রুমাকে ভুলে যাচ্ছ গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব একটু লজ্জা পেয়ে জিব কেটে বলে, তা নয়। তবে আগের মতো সব সময়ে রুমাকে নিয়ে ভাবার মতো সময় হয় না।

কিন্তু মনে পড়ে তো?

একটু-আধটু কি আর পড়ে না।

আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলি, বিরহের ভাবটা কেটে যাচ্ছে না তো গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব আমতা আমতা করে বলে, তা কাটছেনা। তবে আগের মতো তীব্রতা নেই।

সর্বনাশ! গন্ধর্বের কথা শুনে ও হাবভাব দেখে প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা হয় আমার। কুমার বিরহ যদি ও হজম করে বসে থাকে তা হলে হয় রুমাকে অন্যপাত্র দেখতে হবে, নয়তো পাকাপাকিভাবেই আমার কাঁধে ভর করতে হবে। কোনওটাই অভিপ্রেত নয়। আমি ভীষণ উদ্বেগে ওর হাত দুটো ধরে ফেলার চেষ্টা করি। তবে ওর এক হাতে তানপুরা থাকার জন্য মোটে একটা হাতই নাগালে আসে আমার, অতি করুশ স্বরে আমি প্রশ্ন করি, গন্ধর্ব, রুমার জন্য তোমার বিরহের তীব্রতা কেন কমে যাচ্ছে? রুমাকে কি সুন্দর বলে মনে হয় না তোমার? বিবাহিত জীবনের স্মৃতিও কি তোমাকে হন্ট করে না?

গন্ধর্ব খুবই লজ্জা পেয়ে বলে, না না, ওসব ঠিকই আছে। তবে বিরহটা একটু ভোতা হয়ে গেছে বটে। আমার মনে হয় দাদা, দুনিয়ার অধিকাংশ বিরহের গল্পই বোগাস। ঠিক মতো

ব্যায়াম করলে, গানটান গাইলে বা নাচলে এবং আসন করলে বেশিরভাগ বিরহই কেটে যেতে থাকে।

আমি তার সবল পেশিবহুল হাতখানা জড়িয়ে ধরে রেখেই মিনতির স্বরে বলি, তা হলে তুমি ব্যায়াম বা আসন কমিয়ে দাও গন্ধর্ব, অত নাচগানেরই বা দরকার কী পুরুষমানুষের?

গন্ধর্ব ম্লান একটু হেসে বলে, তা আর হয় না দাদা। ব্যায়াম আমার চোখের সামনে থেকে একটা কূপমণ্ডুকতার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। নাচ আর গানখুলে দিয়েছে অন্য এক জগতের দরজা, জীবনটা কী যে ভাল লাগে আজকাল। পৃথিবীকে কত সুন্দর লাগে।

রুমাকে ছাড়াও?- করুণতর স্বরে আমি জিজ্ঞেস করি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গন্ধর্ব বলে, রুমাকে ছাড়াও।

কিন্তু এ তো ভাল কথা নয় গন্ধর্ব!

কিন্তু এ পথ আপনিই দেখিয়েছিলেন দাদা। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ব্যায়াম, নাচ বা গানে বিরহের ব্যথা সত্যিই কমে যায় বলে যদি জানতাম তা হলে কি আর সেই পথ দেখাতাম গন্ধর্বকে? মনে হচ্ছে, আমার অভ্যন্তরে স্থাপিত ক্যালকুলেটর মেশিনটা এই প্রথম একটা ঠিকে ভুল করে ফেলেছে।

আশপাশ দিয়ে গান ও নাচের ক্লাসের মেয়েরা যাচ্ছে। বেশ সুন্দরী সব মেয়ে। যেতে যেতে গন্ধর্বের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। হাসছেও কেউ কেউ চেনার হাসি। আমি তাদের চোখে গর্কে প্রতি একধরনের সপ্রশংস গুণমুগ্ধতার ভাব লক্ষ করে শিউরে উঠি। ব্যায়াম করে গন্ধর্বর চেহারা খুলেছে। গানও বোধহয় সে খুবই ভাল গাইছে আজকাল। নাচও হয়তো মন্দ নাচছে না। মেয়েরা যদি গন্ধর্বকে পাত্তা দিতে থাকে তবে বোকা এবং আহাম্মক রুমাটা তো একেবারেই বেপাত্তা হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতেই একটি সুন্দরী মেয়ে এসে গন্ধর্বকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

খুবই বেকুবের মতো আমি বাসায় ফিরে আসি এবং ভাবতে থাকি।

.

আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্নই ছিল। হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। অঝোর বৃষ্টি। আমার চিন্তা রুমা থেকে দাঁড় বদল করে বৃষ্টির ঘরে গিয়ে বসল। বৃষ্টির লক্ষণ ভাল নয়। বন্যা হবেই। হবে কেন, বন্যা শুরুও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গাঁ গঞ্জে কিছু কিছু নিচু জায়গা ডুবে যাওয়ায় ছোটখাটো ইভ্যাকুয়েশনও শুরু হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল কলেজ বন্যার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বন্যার্তরা এসে ভিড় করবে সেখানে। একারি রিলিফ পৌঁছোতে দেরি হবে আর তা করতে জনগণের নেতারা ছিঁড়ে খাবে প্রশাসনকে। তখন অবশ্যম্ভাবী ডাক পড়বে আমার। আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি। আমার কাছে গম, চাল, চিনি, জামাকাপড় সবই মজুত আছে রিলিফের জন্য। তবু একটু খিচ থেকেই যাচ্ছে। রিলিফ নিয়ে গোলমাল বেঁধেছিল গেলবারের আগেরবার। সরকারি গুদাম লুট হয়েছিল অধরের নেতৃত্বে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, নেতৃত্ব অধর এবারও দেবে। তবে এবার আর সরকারি গুদাম নয়। তার লক্ষ্য হবে আমার নিজস্ব গুদাম।

প্রতিপক্ষ হিসেবে অধর চমৎকার। শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান। বলতে কী, এই অঞ্চলে আমার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তার জন্যই খানিকটা আটকে আছে। আমাদের মধ্যে একটা শেষ লড়াই হওয়া দরকার। সেটা আসন্ন বলেই আমার অনুমান। এক আকাশে যেমন দুই সূর্যের স্থান নেই তেমনিই এই জায়গার পক্ষে দু-দুজন ধুরন্ধর একটা বিশাল বাহুল্য মাত্র। হয় তাকে উচ্ছেদ হতে হবে, নয়তো আমাকে।

অনেকেরই ধারণা অধরের প্রেস্টিজে হাত দেওয়া আর জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো একই ব্যাপার। আমি অবশ্য এরকম কোনও বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই।

দারিদ্র্যসীমার ওই রেলবাঁধটা ডিঙোতে গিয়ে আমাকে বহু উঁচু ও নিচুতে ঠোক্কর খেতে হয়েছে এবং বিবিধ জাতসাপের লেজ দিয়ে বে-খেয়ালে বহুবারই আমি কান চুলকে ফেলেছি। সেই জাতসাপগুলো এখনও বেঁচে আছে কি না আমি তা সঠিক জানি না। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আসল কথা হল, সাপ যেন মানুষের শত্রু, তেমনি মানুষও সাপের শত্রু। অন্যের দাঁত নখ দেখে অধিকাংশ মানুষই ভয়ে পিটিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, ভগবান তাদেরও যথেষ্ট দাঁত নখ দিয়েছেন।

সন্ধেবেলায় আমি একথাটাই গুণেনবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। গুগেনবাবু খুব মনোযোগী শ্রোতা নন। সাধারণত পণ্ডিত ও বক্তারা অন্যের কথা শুনতে ভালও বাসেন না। কিন্তু আজ গুণেনবাবুকে খুবই অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। উনি আমার সব কথাতেই ই দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর বললেন, দাঁত নখের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। আবহমানকাল ধরেই মানুষ ও অন্যান্য পশু দাঁত নখ ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলে একটা কথা আছে পারিজাত।

আমি মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ওরকম একটা কথা প্রায়ই আমার কানে আসে।

গুণেনবাবু একটু চিন্তিত মুখে বলেন, কানে তো আসে, কিন্তু কথাটার মানে জানো?

খুব ভাল জানি না।

সোজা কথা হল, দাঁত নখ যদি কোনওদিন ঈশ্বরের কৃপায় লোপাট হয়ে যায় তবে অন্য কথা। কিন্তু যতদিন মানুষের দাঁত নখ থাকবে ততদিন তারা সেটা ব্যবহার করতেও ছাড়বে না। আমাদের শুধু দেখতে হবে, মানুষ যেন অপ্রয়োজনে বা সামান্য কারণেই তা ব্যবহার না করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল একটা আপসরফা মাত্র। দুর্বল ও সবলের মধ্যে একটা নড়বড়ে সাঁকো বাঁধার চেষ্টা। তবু সেই চেষ্টাটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

আমি একটা হাই গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, তা হবে।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অধরের সঙ্গে তোমার যদি একটা শো-ডাউন হয়ই তবে সেটা হবে দুটো বিগ পাওয়ারের লড়াই আমাদের তাতে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। কিন্তু মনে রেখো, দুটো বড় শক্তির লড়াই যখন লাগে তখন কিছু উলুখাগড়ারও প্রাণ যায়। আমার ভয় সেখানেই।

আমি ভ্রু কুঁচকে নিজের নখ দেখতে লাগলাম।

উনি বললেন, অধর লোকটা খুব খারাপ নয় পারিজাত। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি তো। একটু মাথাগরম গা-জোয়ারি ভাব আছে বটে, কিন্তু মানুষের দায়ে দফায় ও সবার আগে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। এই তো সেদিনও মেথরপট্টির একটা মড়া পোড়ানোর টাকা দিল, নিজে কাঁধে করে মড়া বইল পর্যন্ত। একসময়ে ওর নামই হয়ে গিয়েছিল এ শহরের রবিন হুড।

আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমি জানি।

গুণেনবাবু একটু চাপা স্বরে বললেন, আমি বলছিলাম কি ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নাও।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তো?

ধরো তাই।

তা হলে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারটা আপনি অধরবাবুকেও একটু বুঝিয়ে বলুন না।

গুণেনবাবু অসহায়ের মতো মুখ করে বললেন, মুশকিল হল, তুমি আমার হবু ভগ্নীপতি। তাই অধর ধরেই নিয়েছে যে, আমি তোমার পক্ষে। কাজেই সে আমার কথা কানে তুলছে না। কমলার ব্যাপারটাতেও সে খুব পারটারবড়।

তা হলে আর কী করা যায় বলুন!

কমলা আর অধরের ব্যাপারটাকে আমি সাপোর্ট করছি না পারিজাত। আমি মানি, কোনও স্কুলের হেডমিসট্রেসের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও কলঙ্ক থাকা উচিত নয়। তবু এতকাল এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য যখন করেনি তখন তুমিই বা হঠাৎ ময়লার গামলায় খোঁচা দিতে গেলে কেন?

আপনারা এতকাল ধরে একটা দুর্নীতি ও ব্যভিচারকে সমর্থন করে আসছেন কেন সেটা আমি আজও বুঝতে পারি না। হয়তো অধবকে আপনারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভয় পান এবং কমলা সেনের যোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের ধারণাও অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। আজ উনি তর্ক করার মুডে নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। তবু বলি, তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে আমি তোমার সঙ্গে অধরের একটা মিটমাট ঘটানোর শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গুণেনবাবু মরা মাছের চোখের মতো এক ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, অধরের হাতে অনেক লোক আছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমি জানি অধরবাবুর হাতে অনেক লোক এবং তাও আছে। তদুপরি তিনি হলেন লোকাল লোক, যাকে বলে ভূমিপুত্র। তিনি এখানকার রবিনহুডও বটে। শহরের বেশিরভাগ লোকেরই সমর্থন অধরের দিকে। এ সবই আমি জানি। আমি তার সঙ্গে লাগতেও চাই না। কিন্তু একটা অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া উচিত বলে মনে করি।

গুণেনবাবু চুপ করে গেলেন। অবশ্য এর চুল আর অন্য একটা কাল লি। ঘরের বাইরে ভেজা ছাতাটা বারান্দায় রেখে জহরুবাবু গায়ের অলআড়ছেন। মুখে বিগলিত হাসি।

এই একজন লোক যিনি এখনও কিভাবে আমার দলে। অন্য কতদিন ইন আমার দলে থাকবেন তা বলা শক্ত। প্রতিমার চাকরিটানাহলে হয়তো চট করে দলবদলে ফেললো এই যুগে দল বদলের একটা বীজাণু এসে গেছে।

জহরবাবু ঘরে ঢুকতেই গুণেবাবুচলি হেপারিজাত বলে উঠেপড়লেন। আমিরুকরলাম, গুণেনবাবু যাওয়ার সময় ভুল করে নিজের ছাতটার বদলে অহরবাবুর মুতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছুই বললাম না। এইছতা দলের সঙ্গে সঙ্গে যদি দুজনের মানসিকতারও একটু বদল হয়? হতেও তো পারে! দুনিয়ায় কি অঘটন আজও ঘটে না।

জহরবাবু বসে রুমাল দিয়ে ভাল করে মাথা মুছেবললেন, ওঃ! প্রতিমা তো সেই থেকে কেবই আপনার কথা বলছে। যেমন সুন্দর চেহারাখানা, তেমনি অমায়িক ব্যবহার, প্রসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

কথাটায় সত্যতা কত পারসেন্ট তা হিবে করতে তেও আমি বেশ খুশিই বোধ করলাম। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের আমি তেমন করে আকর্ষণ করার চেষ্টা কখনও করিনি বটে, কিন্তু কেউ আকৃষ্ট হয়ে থাকলে ভালই লাগে।

বললাম, তাই নাকি?

আর বলবেন না। দিনরাত শুধু আপনার কথা। আজ দুপুরে ওর মাকেও বললি, পারিজাতবাবু দরিদ্র অবস্থা থেকে যেভাবে ওপরে উঠে এসেছে তা নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা যায়। আপনার জীবনী লেখার জন্য তো ও একেবারে মুখিয়ে আছে।

জহরবাবু সেই জীবনীপ্রসঙ্গেই আটকে আছে। র মনটা হল খারাপ আমোফান রেকর্ডের মতো। যেখানে পিন আটকায় ঘুরেফিরে সেই জায়গাটাই বাজতে থাকে।

তবু এইসব কথাতেও আমি কেন যেন খুশি হৰি। স্তাবকতা যে মানুষের কত বড় শত্রু। বেশ খোশ গলায় বললাম, তাই নাকি?

জহরবাবু হঠাৎ টেবিলে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বললেন, ওই ছোকরাটাকে আপনি জোটালেন কোথা থেকে বলুন তো!

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ছোকরা?

ওই যে অভিজিৎ গাঙ্গুলি না কী যেন নাম।

আমিও চাপা গলায় বললাম, কেন বলুন তো।

আরে দূর! দূর! ও মাস্টারি করবে কী মশাই? ও তো ডেনজারাস নকশাল।

তাই নাকি?

আরে হ্যাঁ, বলছি কী তা হলে? মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির নাতি। বংশটাই গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপের। এ ছোকরা তো শুনি খুনটুনও করেছে।

কোথা থেকে শুনলেন?

খবর নিয়েছি আর কি! ও ছোকড়া স্কুলে ঢুকলে স্কুল লাটে তুলে দেবে।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, তা হতে পারে। তবে ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। হায়ার সেকেন্ডারিতে তিন বিষয়ে লেটার পেয়েছিল।

নির্বিকার মুখে মিথ্যে কথাটা বলে আমি জহরবাবুর রিঅ্যাকশন লক্ষ করতে লাগলাম। জহরবাবু অসহায়ভাবে নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, তিনটে লেটার!

তিনটে বলেই তো জানি।

টুকেছে তা হলে। বোমা বন্দুক বানিয়ে আর মানুষ খুন করে পড়াশুনোর সময়টা পেল কখন বলুন।

এই একটা ব্যাপার সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব গভীর। তাই আমি খুব গম্ভীর হয়ে জহরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনও পরীক্ষায় টুকেছে?

আমি!-জহরবাবু থতমত খেয়ে বললে,কী যে বলেন!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তা হলে আপনার একটা জিনিস জানা নেই। টুকে পাশ করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। কারণ চোথা দেখে দেখে খাতায় তুলতে ডবল সময় লাগে। তার ওপর গার্ডের দিকেও নজর রাখতে হয়। যদি টোকার অভিজ্ঞতা থাকত তা হলে বুনে, তিন ঘটায় মেরেকেটে ত্রিনিক্সের ব্যবস্থা করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। তা যদি যেত তা হলে আমিও হায়ার সেকেন্ডারিতে সব কটা বিষয়ে লেটার পেতাম।

জহরবাবু আমার স্বীকারোক্তিতে ভারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আবার নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তাই বুঝি।

আমি গলায় যতদূর সম্ভব বিষাদ মাখিয়ে বললাম, হ্যাঁ জহরবাবু, আমিও টুকেই পাশ করেছি। সবকটা বিষয়ে।

জহরবাবু সজোরে গলা খাঁকারি দিয়ে চট করে লাইন পালটে বললেন, আপনার কথা আলাদা। একদিকে তীব্র দারিদ্র্য, অন্যদিকে সাতিক জীবন সংগ্রাম। মরণপণ লড়াই। হয়তো ঘরে বাতি জ্বালাবার মতো কেরোসিন নেই বই নেই, খাতা নেই, পেনসিল নেই। অথচ পাশ করতেই হবে। ওরকম কনডিশনে মশাই, আমার তো মনে হয় না টোকা অপরাধ।

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, কথাটা প্রতিমাকে বলনে।

কোন কথাটা?

আমি যে পরীক্ষায় টুকে পাশ করেছি সেই কথাটা। ও তো আমার জীবনী লিখবে, ওর এসব জানা দরকার।

খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জহরবাবু বললেন–বলব। কিন্তু দেখবেন, ও আপনাকে ভুল বুঝবে না। আপনার ওপর ওর এ এতই বেশি যে, আপনার প্রতিটি কাজের মধ্যেই ও একটা মহত্ত্ব দেখতে পায়। কিন্তু ওই অভিজিৎ ছোঁড়া সম্পর্কে আমার একটু খিচ থেকেই গেল। অতগুলো লেটার ও বাগালে কী করে? ওর হয়ে অন্য কেউ পরীক্ষা দেয়নি তো?

তা কী করে বলব? দিতেও পারে।

লেটার প্রতিমাও গোটাকয় পেত, বুঝলেন পারিজাতবাবু! কিন্তু আচমকা টাইফয়েড হয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। টাইফয়েড বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষার আগে মাস দুয়েক তো প্রতিমা বই খুলতেই পারত না। অক্ষরের দিকে তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করত।

বটে! তারপর?

সে আর বলেন কেন? আমি গরিব মানুষ, কষ্টেসৃষ্টে একজন ভাল মাস্টার রাখলাম। মাস্টার পড়ত, প্রতিমা শুনত। কিন্তু ব্রেনটা ভাল বলে শুনেই মনে রাখতে পারত।

ওভাবেই পরীক্ষা দিল?

পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না সেবার মেয়েটার। বলেও ছিল, এক বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর পরীক্ষা দিলে গোটা তিন-চার লেটার পাবেই। তা আমি রাজি হলাম না। আবার বছরটাকের ধাক্কা।

আমি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, গরিবদের বড় কষ্ট।

বড় কষ্ট। প্রতিধ্বনি করে জহরবাবু বলেন, একবছর নষ্ট করা কি আমাদের পোয়? তবে মাস্টারটি পেয়েছিলাম চমৎকার। চালাকচতুর ছোকরা। সে ভরসা দিল, সব ম্যানেজ করে দেবে।

দিয়েছিল?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে জহরবাবু বললেন, তা দিয়েছিল বটে।

কীভাবে?

জহরবাবু ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলেন, ওই আর কি!

আমি বুঝলাম এবং আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

জহরবাবু করুণ স্বরে বললেন, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। চোথা দেখে লিখলে পাশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু লেটার পাওয়া যায় না। আপনি অতিশয় বিজ্ঞ মানুষ।

অভিজ্ঞও। আমি বললাম।

প্রতিমার সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আপনার আশ্চর্য মিল।

তাই নাকি?

প্রতিমাও বলছিল। আপনার ডান গালে একটা তিল আছে। ওরও তাই।

আমি ডান গালে হাত বুলিয়ে বললাম, আছে নাকি? লক্ষ করিনি তো!

জহরবাবু একটু হেসে বললেন, নিজেকে আর আপনি কতটুকু লক্ষ করেন? আপনার হচ্ছে হাতির মতো দশা। হাতি যদি বুঝতে পারত যে সে কত বড় তা হলে তুলকালাম বাঁধিয়ে

দিত। কিন্তু নিজেকে তো সে দেখে না। তাই বলছিলাম, আপনার দেখাশোনারও একজন লোক দরকার।

জহরবাবুর ইঙ্গিতটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। কিন্তু মনে হল, উনি কিছু বলতে চাইছেন। গভীর ও গোপনীয় কিছু।

আমি নীতভাবে বললাম, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উনি গলা খাকারি দিয়ে বললেন, বিপত্নীকদের ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

গুণেনবাবুর বোন অবশ্য ভাল মেয়ে। তবে বড্ড রুগ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জহরবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, প্রতিমা নিজেই আপনার কাছে আসবে। আপনার জীবনের কথা জানতে খুবই আগ্রহ ওর। বলছিল, পারিজাতবাবুর কাছে গিয়ে বসে থাকলেও জ্ঞানলাভ হয়।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে রইলাম। অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই অন্যমনস্ক এবং উত্তেজিত জহরবাবু ভুল ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাকে নিষেধ করলাম না।

ঘরে বসে আমি বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অনেক কিছু ভাবলাম। আমার মন পাখির মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে যায়, কিছুক্ষণ বসে, আবার ওড়ে। গুণেনবাবু, অধর, প্রতিমা... বৃষ্টি...

রাতে খাওয়ার টেবিলে রুমার সঙ্গে দেখা। খুবই সন্তর্পণে দূরত্ব বজায় রেখে আমি বসলাম এবং অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমাদের দারিদ্র্যের দিনে বাস্তবিকই আমরা প্রকৃত অর্থে ছোটলোক হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অল্প বয়সেইআমরা সবরকম খারাপ কথা ও গালাগাল শিখি এবং তা প্রয়োগ করতে শুরু করি। একথাও ঠিক যে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত শুয়োরের বাচ্চা দিয়ে। কালক্রমে অবশ্য আমি সেইসব শব্দকে সংযত ও সংহতভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে প্রয়োগ করি না। অনভ্যাসে বহু তীক্ষ্ণ গালাগাল ভুলেও গেছি। কিন্তু রুমা কেন যেন ভোলেনি। যথেষ্ট সংস্কৃতির চর্চা করা সত্ত্বেও ওর মধ্যে সেই নর্দমার বস্তিযুগের ঘরানা এখনও বেঁচে আছে। রেগে গেলেই মা সেই নর্দমার মুখটি খুলে দেয়। তখন আর ভদ্রতার লেশমাত্র থাকে না। সেই ভয়ে আমি কোনও সময়েই ওকে চটাই না। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওকে এবার একটু সাবধান করে দেওয়াও দরকার। গর্ব যদি সত্যিই ওর হাহাড়া হয়ে যায় তা হলে আমার বিপদ।

আমি অন্যদিকে চেয়ে থেকেও ওর মুড বুঝবার চেষ্টা করলাম। মনে হল, মুড খুবই ভাল। এত বৃষ্টিতে তা-ই হওয়ার কথা।

সাবধানে বললাম, গন্ধর্বর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

মা একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। পাতাটা ঝটাং শব্দে উলটে দিয়ে বলল, দেখা হতেই পারে।

আমি একটু ফাঁক দিয়ে বললাম, ওর অনেক ফ্যান হয়েছে দেখলাম।

রুমা ঝটাং করে আর একটা পাতা উলটে দিল। বলল, তাই নাকি? কীসের ফ্যান, নাচ না গান না ব্যায়াম?

তা কে জানে! মনে হল তিন রকমেরই।

ঠোঁট উলটে রুমা বলল, দু চোখে দেখতে পারি না। মাগো! গায়ে গিল গিল করছে গোল গোল মাংসপিণ্ড! তার ওপর আবার পুরুষ হয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচ, গলা কাঁপিয়ে গান! ওয়াক!

আমি ভারী অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলাম। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, তোর পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু বেশ সুন্দরী সব মেয়ে জুটে গেছে ওর চারধারে।

রুমা সশব্দে ম্যাগাজিনটা টেবিলে ফেলে দিয়ে, চেয়ারটা এক ধাক্কায় ছিটকে ঘর থেকে পটাং পটাং চিটর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

রেগে গেছে। হয়তো রাতে খাবেও না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করি।

# ৬. অভিজিৎ

দাদুর সঙ্গে বসবাস করতে গেলে যে মনোভাব এবং চালচলনে অভ্যস্ত হতে হয় তা আমার সহজে হবে না। সন্ধের এবং বিশেষ করে রাতের দিকে একটু বইপত্র না পড়লে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু দাদুর ঘরে বাতির জোগাড় নেই। সরু অঙ্গুষ্টপ্রমাণ মোম সম্বল। তাতে না হয় আলো, না হয় তার আয়ু বেশিক্ষণ।

দাদুর কাণ্ড শুনে ফুলমাসি হেসে গড়াগড়ি খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর তেল ভরে প্রায় নতুন একটা হারিকেন দিয়ে বললেন, এটা জ্বালিয়ে নিস। কাল যখন আসবি নিয়ে আসিস, আবার তেল ভরে চিমনি মুছে দেব।

দাদুর ঘরের অন্ধকারটা সেই হ্যারিকেনের দাপটে পিছু হটল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা কাঁচের আলমারিবন্দি পুরনো কিছু বই আছে। প্রায় সবই পড়া। বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, বিকেল থেকে অনেকেই আছেন। আমি পুরনো প্রবাসীর একটা বাঁধানো খণ্ড নিয়ে বসে গেলাম।

দাদু বার দুই এসে হ্যারিকেনটা দেখলেন। তারপর থাকতে না পেরে বললেন, কে দিল? গণেশের বউ নাকি?

হ্যাঁ।

তেল পাচ্ছে কোথায়? মহিমের দোকানে এসেছে বুঝি?

কেন, আপনার লাগবে? গণেশকাকাকেবললেই এনে দেবে।

দাদু ঠোঁট উলটে বললেন, তেল দিয়ে কী করব? হ্যারিকেনই নেই। পুরনো দু-তিনটে যা-ও ছিল সব ভেঙে গেছে।

তা হলে তো কথাই নেই।

হ্যারিকেনটা তো বেশ মজবুত দেখছি। ব্রিটিশ আমলে জার্মান হ্যারিকেন পাওয়া যেত। হেঁচা জিনিস, বহুদিন চলত। এখনকার দিশিগুলো বড় হলকা পলক।

সে জিনিস আর কোথায় পানে?

আজকাল হ্যারিকেনের দাম কত হয়েছে বলো তো!

যেমন জিনিস তেমন দাম। তবে পনেরো-ষোলো টাকার নীচে বোধহয় পাওয়া যায় না।

ও বাবা। এত? দিনে কালে হল কী?

সেই কথাই তো সবাই বলাবলি করে আজকাল।

একটু আগে ধুপ করে একটা শব্দ হল শুনেছ?

না তো।

হয়েছে। পুরনো পাকঘরের পিছনের গাছটা থেকে নারকোল পড়ল।

ও।

একবার যাও না। নিয়ে এসো।

এত রাতে।

রাত কোথায়? হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও। নইলে সকালে ফুলকুড়ুনিরা এসে নিয়ে যাবে। রোজ নিয়ে যায়।

যাক না। একটা নারকোল গেলে যাবে।

রোজ একটা দুটো করে গেলে বছরে কতলে যায় হিবে করেছ?

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, বাইরে তো এখন একটু জল।

তোমাকে বলতাম না। আমি নিজে রাতবিরেতে চোখে দেখি না। পড়ে-উড়ে গেলে মুশকিল।

একটা টর্চ দিন।

টর্চ কীসে লাগবে। হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও।

গত দুদিনে দাদুকে আমি প্রায় চার বস্তা নারকোল বিক্রি করতে দেখেছি। গড়পরতা এক একটার দর পাঁচ সিকে। চার বস্তায় কমকরেও শত খানেক নারকোল হবে। দাদুর আয় সে হিসেবে মন্দ নয়। তবু একটা টর্চ কিনবেন না। কিংবা হয়তো আছে, বের করবেন না।

অগত্যা হ্যারিকেনটা নিয়ে বেরোতে হল। একটু আগেই বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু আকাশ গোঁ গোঁ করছে। দাপটের সঙ্গে বইছে বাতাস। হ্যারিকেনের লাফাতে লাগল।

দাদু তার মোটা বেতের লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললে, এটা সঙ্গে নিয়ে যাও। লতা-টতা অবশ্য এই দুর্যোগে বেরোয় না। তবে হেলে ঢোঁড়া আছে। সঙ্গে লাঠি রাখা ভাল।

দাদুর অনুমান যে নির্ভুল তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। এই বাড়ির সঙ্গে দাদুর সমস্ত সত্তা এমন জড়িয়ে গেছে যে, ঘরে বসে থেকেও একটা অদৃশ্য অ্যানটেনা দিয়ে কোথায় কী ঘটছে তা টের পান।

পুরনো রান্নাঘরের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে বাস্তবিকই নারকোলটা পাওয়া গেল। সেটা বগলদাবা করে ফেরার সময় আমার কিন্তু বিরক্তিটা রইল না। কেমন যেন একটা মায়া জন্মাল। নিজের বাড়ি, নিজের জমি, নিজেদের দখলি গাছপালা, এর একটা আলাদা

ব্যাপার আছে। সব কিছুই পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না, কলকাতায় আমরা এরকমটা ভাবতেই পারি না। সেখানে কান চুলকোনোর জন্যও পয়সা দিতে হয়।

ঘরে এসে দাদুর হাতে নারকোলটা দিতেই উনি নেড়ে দেখলেন, জলের শব্দ হচ্ছে কি না। তারপর চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার চাকরির কী হল?

এখনও কিছু হয়নি।

হবে মনে হয়?

না হওয়ারই কথা। আর একজন লোকাল ক্যান্ডিডেট আছে।

কে বলো তো!

জহরবাবু নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ে।

জহর বাঁড়ুজ্জে নাকি?

হতে পারে। পদবিটা জানি না।

ইরিগেশনে এক জহর আছে জানি তার মেয়ে কি তোমার চেয়ে বেশি পাশ?

হ্যাঁ। বি এড।

দাদু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তা তুমি এতদিন ঘরে বসে কোন ভেরেন্ডা ভাজছিলে? বি এডটা পাশ করতে পারোনি?

তখন কি জানতাম যে মাস্টারি করব?

তা বলে একটা মেয়ে তোমাকে লেখাপড়ায় ডিঙিয়ে বসে থাকবে, এ কেমন কথা?

ডিঙিয়ে বেশিদূর যায়নি। তবে একটা পাশ বেশি করেছে বটে।

তবে?

আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? পারিজাতবাবু এখনও আমাকে না করেননি।

কী বলেছে?

গণেশকাকা খোঁজ রাখছে। যা বলার ওঁকেই বলবে।

আবার ডেকে পাঠাবে বলছ?

পাঠাতেও পারে।

চাকরি তোমার একটা হওয়া দরকার। যদি এখানে থাকতে পারো তো খুব ভাল।

দেখছি কী হয়।

ঘরে বসে সময় না কাটিয়ে একটু পারিজাতের কাছে যাতায়াত করলেও তো পারো।

তদবির করতে বলছেন?

উপায় কী? তদবির বরাবরই করতে হত। এখনও হয়।

ওসব আমি ভাল পারি না।

পারতে হয়। তুমি এখানে থেকে চাকরি করলে শেষ বয়সে আমাকে আর বাস্তুভিটে বিক্রি করতে হয় না। তুমিই সব দেখেশুনে রাখতে পারবে।

চেষ্টা তো করছি।

তুমি চেষ্টা করছ না। একে কি চেষ্টা বলে?

আমার হয়ে গণেশকাকা করছেন।

গণেশটা এমনিতে ভাল লোক, কিন্তু কথায় বার্তায় পোক্ত নয়। ও কি পারবে? তুমি নিজেই কাল একবার যাও। রোজই যাও। ওতে ব্যাপারটা ভুল পড়বে না। তোমাকে দেখলে মনে পড়বে।

মেয়েটার বাবা খুব তেল দিচ্ছে।

দেবেই। চাকরির যা বাজার! তুমি কাল সকালেই যাও। একটা মেয়ের কাছে হেরে এসো না।

দাদু কথাটা ভুললেন না! ভোর না হতেই আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, ওঠো, ওঠো, বেলা হয়ে যাবে। এইবেলা বেরিয়ে পড়ো।

জ্বালাতন আর কাকে বলে। তবে উঠতেও হল।

পারিজাতবাবুকে গিয়ে আমি কী বলব তা আমার মাথায় এল না। অনিকভাবে ধীরে ধীরে চারদিক দেখতে দেখতে আমি সাইকেল চালাতে থাকি।

চারদিকে আজ অবশ্য জল ছাড়া প্রায় কিছুই দেখার নেই। সাইকেলের চাকা সিকিভাগ জলের তলায়।খানা-খন্দে পড়ে ঝাং ঝাং করে লাফিয়ে উঠছে। কোথাও ঋথকে আঠালো কাদায় পড়ে থেমে যাচ্ছে ঘচাৎ করে। আমার প্যান্টের নিম্নাংশ গুটিয়ে রাখা সত্ত্বেও কাদায় মাখামাখি হল। একজোড়া হাওয়াই চপ্পল ধার দিয়েছে ফুলমাসি। সেও কাদা থেকে টেনে তুলতে গিয়ে একটা স্ট্র্যাপ ফচাক করে খুলে গেল।

এসব আমার অভ্যাস নেই বটে, তা বলে খুব খারাপ লাগছে না। এই গাঁয়ে আমার জন্ম। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এক দুরারোগ্য আকর্ষণ থাকবেই। তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাক বা না থাক। এই গাঁয়ের আরও একটা আকর্ষণ ফুলমাসি। আমার প্রতি তার মেহ

যুক্তিসিদ্ধ নয়। আমি তার জামাই হতে পারতাম। কিন্তু হইনি। তবু আমার প্রতি তার এক দুর্জয় দুর্বলতা। কারণটা আমি কখনও খুঁজে দেখিনি। যাকগে, কিছু জিনিস না জানলেও চলে যায়। হয়তো না জানাই ভাল।

সকালে যখন সাইকেলটা চাইতে গেলাম তখন ফুলমাসি চা আর তার সঙ্গে রুটি বেগুনভাজা খাওয়ালেন। খেতে খেতে একসময়ে বলেই ফেললাম, খুব তো আদর দিয়ে মাথায় তুলছ। পরে বুঝবে।

কী বুঝব রে?

যদি চাকরি পাই তো পাকাপাকি আস্তানা গাড়তে হবে এখানে। তখন রোজ জ্বালাতন হয়ে বলবে, অভীটা গেলে বাঁচি।

তাই বুঝি! তুই তো হাত গুনতে জানিস।

আমি মাথা নেড়ে বলি, পাকাপাকিভাবে থাকলে দাম কমে যাবে।

মাসি ঝগড়ার গলায় বলল, সে যদি কমেই তা হলে বরং তোরকাছেই আমার দাম কমবে। তখন বন্ধু হবে, বান্ধব হবে, আড্ডা হবে, মাসি মরল কি বাঁচল কে তার খোঁজ করে। আর যদি বিয়ে করিস তবে তো আর কথাই নেই। বছর ঘুরলেও বাছা আর এমুখো হনে না।

এসব অবশ্য কথার কথা। সবকিছুই নির্ভর করছে একটা জিনিসের ওপর, চাকরিটা আমার হবে কি হবে না। জহরবাবু তার মেয়েকে ঢোকানোর জন্য যে পন্থা নিয়েছেন তা যদি সফল হয় তবে আমার হওয়ার চান্স নেই। কিন্তু পারিজাত লোকটিকে আমার বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে। লোকটা জহরবাবুর ফাঁদে পা দেবে বলে মনে হয় না। যদি প্রতিমা আর আমার মধ্যে ওপেন কমপিটিশন হয় তবে আমার চান্স কিছু বেশিই। প্রতিমা বি এড, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার রেজাল্টটা একটু ভাল। চাকরিতে এই পরীক্ষাটার রেজাল্টই গুরুত্ব পায় বেশি।

বড় রাস্তায় উঠে দেখি, বহু লোকজন জড়ো হয়েছে। রাস্তার উল্টোদিকের মাঠেও বহু লোক। চাংড়াপোতার বাঁধের ওপর সারসার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে লাঠি-সোটা। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব চারদিকে।

একজন চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে মোড়ল, গণ্ডগোল নাকি?

লোকটা আমায় চেনে। বলল, চাংড়াপোতার লোকেরা বাঁধ কেটে দিতে এয়েছিল। তাই সবাই বাঁধ পাহারা দিচ্ছে।

ইরিগেশনের খালের ওপাশে চাংড়াপোতা। জায়গাটা আমি চিনি। ওখানকার ঝিঙে খুব বিখ্যাত। বললাম, বাঁধ কাটতে চায় কেন? ওপাশে জল নাকি?

খুব জল। চাংড়াপোতায় শুধু বাড়িঘরের চালটুকু দেখা যাচ্ছে, আর সব জন্মে তলায়।

আমি একটু শিউরে উঠলাম। বাঁধ কেটে দিলে মউডুবি চোখের পলকে সাগরদিঘি হয়ে যাবে। ঘরে বুড়ো দাদু।

আমি দোকানিকে বললাম, মারদাঙ্গা লাগলে আমাকে খবর দিয়ে। আমিও জুটে যাবখন। পাহারা দিতে হলে তাও দেব।

লোকটা হেসে বলল, দরকার হবে না। আমরা তো আছি। সকলেরই জান কবুল।

লাশ টাশ পড়েছে নাকি?

আজ্ঞে না।

আমি খানিকটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে রওনা হলাম। মনে মনে একটু হাসিও পাচ্ছে। আমরা কত না স্বার্থপর! চাংড়াপোতা ডুবুক, মউডুবি না ডুবলেই হয়। অন্যে মরছে মরুক, আমরা বেঁচে থাকলেই হয়। এই স্বার্থপরতাই এখন ভারতবর্ষের জীবন-বেদ। আমরা তার মধ্যেই

লালিত-পালিত হয়েছি। আমাদের জ্যেষ্ঠরা এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের শেখাতে পারেননি।

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চাংড়াপোতা থেকে খাল পার হয়ে একটা ছেলে স্কুলে পড়তে আসত। তখনও চাংড়াপোতায় স্কুল হয়নি। সেই ছেলেটা ছিল বিশু। আমার খুব বন্ধু। একবার তার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম।

কে জানে বিশু এখনও বেঁচে আছে কি না। না থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকাল আমার বয়সি ছেলেদেরও বেঁচে থাকা সম্পর্কে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। অবশ্য বিশু বেঁচে থাকলেও যে চাংড়াপোতাতেই আছে এমন নয়। আবার থাকতেও তো পারে!

একবার ইচ্ছে হল, সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে চাংড়াপোঁতার দিকটা দেখে আসি। তারপর ভাবলাম, থাক। কী দরকার? কিছু ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকাই ভাল।

আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ-ভাঙা একটু রোদও উঠেছে। গাছপালা আর ভেজা মাটির গন্ধ ম ম করছে। আমি বুক ভরে দম নিলাম। পোটলা-পুঁটলি নিয়ে কিছু লোক গাছতলায় বসে গেছে। ইটের উনুনে রান্না চাপিয়েছে কেউ কেউ। কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলেছে শহরের দিকে। বুঝতে অসুবিধে নেই, আশপাশের নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবেছে।

ডুববেই। বহুকাল ধরে এ দেশের নদীগুলির কোনও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার হয়নি। অধিকাংশ নদীখাতই পলি পড়ে পড়ে অগভীর হয়ে এসেছে। এক ঢল বর্ষার জলও বইতে পারে না। নিকাশি খাল সংখ্যায় অপ্রতুল। প্রতিবছর তাই কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর অবধি প্রায় সব জেলাই ভাসে। বছরওয়ারি এই কন্যা সামাল দেওয়া কিছু শক্ত ছিল না। চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ যদি যথেষ্ট শক্ত-পোক্ত হত তা হলে গ্রামটা ভেসে যেত না। আমি জানি, খরার সময় ওই সেচখাল শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। আর ভারী বর্ষা হলে সেই খালই হয় বানভাসি।

সাইকেল নিয়ে আমি সারা শহর কয়েকবার টহল দিলাম। বলতে কি পারিজাতের বাড়ি হানা দিতে আমার একটু লজ্জা-লজ্জাই করছে।

গণেশকাকার দোকানে নামতেই গণেশকাকা বলেন, পারিজাতবাবুর বাড়ি হয়ে এলি?

না। এখনও যাইনি।

সর্বনাশ! উনি যে একটু আগে জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হেসে বললাম, তাড়া কীসের?

গণেশকাকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন, তাড়া নেই মানে! জহরবাবু পিছনে জোকের মতো লেগে আছে তা জানিস? কাল রাতেও গিয়েছিল পারিজাতবাবুর কাছে। আজ সকালে অসীম দিদিমণির দাদা গুণেন এসে বলে গেল। এই দেখ, জহরবাবুর ছাতা।

গণেশকাকা কাঁচের আলমারির তলা থেকে একটা বাঁশের উটওলা পুরনো ছাতা বের করে বিজয়গর্বে আমাকে দেখালেন।

কিন্তু জহরবাবুর ছাতা দেখেও আমি উত্তেজিত হলাম না। শুধু নিরুৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওটা পেলেন কোথায়?

কাল পারিজাতবাবুর ওখানে গুণেনবাবুর সঙ্গে জহরবাবুর দেখা হয়েছিল কিনা। ভুল করে গুণেনবাবু জহরবাবুর ছাতাটা নিয়ে এসেছিল। আমাকে দিয়ে গেলেন ফেরত দেওয়ার জন্য।

আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বলি, আপনি ফেরত দেবেন কেন? অন্যের ফাইফরমাশ খাটা কি আর কাজ?

গণেশকাকা অতি উদার একটু হাসলেন। বললেন, এটুকু করা কি আর ফাইফরমাশ খাটা রে? ফেরার সময় জহরবাবুর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাব, পথেই পড়বে। গুণেনবাবুর সময় ছিল না।

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, বরং আমাকেই দিন। দিয়ে আসি।

তুই দিবি? তা ভাল কথা।

ছাতা ফেরত দেওয়াটা আমার ছুতো মাত্র। জহরবাবু বা তার মেয়ের সঙ্গে আমার আর একবার মুখোমুখি হওয়া দরকার। মেয়েটার চাকরি কতখানি দরকার তা আমি জানতে চাই। যদি বুঝি ওদের প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশি তা হলে আমি চাকরিটা ছোঁব না।

গণেশকাকার নির্দেশমতো জহরবাবুর বাড়ি পৌঁছোতে আমার সময় লাগল সাইকেলে মিনিট দেড়েক। বাড়িটা খুবই পুরনো, জীর্ণ এবং ছোট। বাগানের বেড়া ভেঙে পড়েছে বৃষ্টিতে। প্রকাণ্ড একটা গোরু ঢুকে ফুলগাছ খেয়ে নিচ্ছে আর প্রতিমা একটা ছাতা নিয়ে সেটাকে তাড়ানোর অক্ষম একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। বাড়ির সামনে আমাকে নামতে দেখেই সভ য়ে ছাতাটা পিছনে লুকিয়ে ফেলে একদম স্ট্যাচু হয়ে গেল।

আমি বললাম, চিনতে পারছেন? আমি আপনার প্রতিপক্ষ।

প্রতিমা ভারী লজ্জা পেল। আটপৌরে পোশাকে তাকে আজ মন্দ লাগছেনা দেখতে। সাজগোজ বেশি না করলেই যে মেয়েদের বেশি সুন্দর লাগে এই সত্যটা মেয়েরা কখনওই বোঝে না।

প্রতিমা সামান্য একটু হেসে বলল, চিনব না কেন? আসুন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন?

না। বাবা অফিসে গেছেন।

আমি ছাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলি, এটা উনি কাল পারিজাতবাবুর বাড়িতে ফেলে এসেছেন। নিন।

প্রতিমা তার পিছনে লুকনো ছাতাটা বের করে চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! তাই আমি ভাবছি, বাবার ছাতায় আমি যে নামের আদ্যক্ষর সাদা সুতো দিয়ে তুলে দিয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল।

আমার ছাতা বিনিময় করলাম। সেইসঙ্গে হৃদয় বিনিময়ও হয়ে গেল কি না বলতে পারব না। তবে এই সময়ে প্রকাণ্ড গোটা একটা কলাবতী ফুলের গাছ মুড়িয়ে মসস করে খাচ্ছিল। আমরা সেটা দেখেও দেখলাম না।

হাঁস যেমন গা থেকে জল ঝড়ে প্রতিমা তেমনি লজ্জাটা ঝেড়ে ফেলে খুব স্মার্ট হয়ে গেল। বলল, আসুন, গরিবের বাড়ি চা খেয়ে যান। কষ্ট করে এসেছেন।

প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। ঘরের দেয়ালে বহুকাল কলি ফেরানো হয়নি। বর্ষায় নোনা ধরে গেছে। বাইরের ঘরে তিনটে টিংটিঙে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট্ট চৌকি। দেয়ালে কিছু সূচিশিল্প, একটা নেতাজির ছবিওলা ক্যালেন্ডার আর গোবরের চাপড়ার ওপর তিনটে কড়ি লাগানোদরজা জানলা বড়ই নড়বড়ে। একটা জানলার পাল্লায় ছিটকিনি নেই, তার বদলে পাটের দড়ি লাগানো।

কারা বেশি গরিব, প্রতিমারা না আমরা, তা ভাবতে ভাবতেই প্রতিমা ভিতরবাড়ি থেকে এক পাক ঘুরে এসে আমার মুখোমুখি চৌকিতে বসল।

চাকরিটা আপনারই হবে! বলল সে।

কেন?

আমার তেমন ইচ্ছে নেই।

তাই বা কেন?

আমি পারিজাতবাবুর জীবনী-টীবনী লিখতে পারব না। বাবা ভীষণ বোকা। কেবলই আমাকে খোঁচাচ্ছে, পারিজাতবাবুর জীবনী লিখতে। বলুন তো, এসব করতে সম্মানে লাগে না?

আমি বললাম, জীবনী লেখার কথাটা আমিও সেদিন শুনেছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো! এত লোক থাকতে হঠাৎ পারিজতাবাবুর জীবনী লেখার কী দরকার পড়ল?

আমারও তো সেই প্রশ্ন। বাবাকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু বাবা কেবল বলে, লোকটা অহংকারী। জীবনী লেখার কথা শুনলে খুশি হয়।

হয় নাকি?

তা কে জানে। আমি লোকটাকে ভাল চিনি না। তবে শুনেছি, পারিজাতবাবু ভাল লোক নন।

আমিও ওরকমই শুনেছি। তবে লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগেনি।

কিন্তু লোকটা খারাপই। ওর বউ আত্মহত্যা করেছিল জানেন?

তাই নাকি?

বিষ খেয়ে। সবাই বলে ওটা খুন।

তদন্ত হয়নি?

কে জানে! হলেও পারিজাতবাবুকে ধরা সহজ কাজ নয়।

আপনি জানেন, খুন?

তা-ই তো সবাই বলে।

যাঃ। ওসব গুজব। বুদ্ধিমান লোকেরা কখনও বউকে খুন করে না।

তা হলে কী করে?

ডিভোর্স করতে পারে। খামোক খুন করতে যাবে কেন?

বামোকা মোটেই নয়। ওর বউ অনেক গোপন খবর রাখত। সেগুলো ফাস করে দিতে চেয়েছিল বলেই একদিন বেচারার জলের গেলাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাঝরাতে ঘুমের চোখে সেই জল খেয়ে মেয়েটা মরে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপন খবরটা কী রাখত ওর বউ?

পারিজাতবাবুর অনেকরকম বে-আইনি কারবার আছে তো। সেইসব।

আমি পা নাচিয়ে লঘু স্বরে বললাম, তা হলে আর পারিজাতের দোষ কী? গোপন খবর ফাঁস করতে চাওয়াই তো অন্যায়। আইন ওটাকে বলে ব্ল্যাকমেল।

প্রতিমা বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওকে সাপোর্ট করছেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ওকেও করছি না, ওর বউকেও করছি না। মনে হয় ব্যাপারটা হয়েছিল শঠে শাঠ্যং।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, পারিজাত খুন করতে পারে না এমন নয়। অতিশয় উচ্চাশাসম্পন্ন, অহংকারী ও যশপ্রতিষ্ঠালোভী লোকের পক্ষে কাজটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু পারিজাতকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় না যে, সে খুন-টুন করেছে। লোকটার ক্ষুরধার বুদ্ধি। এ যদি কখনও খুন করে তবে এমন সূক্ষ্ম পন্থায় করবে যাতে তার ওপর লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না।

প্রতিমা অবশ্য তর্কের গলায় বলল, মোটেই শঠে শাঠ্যং নয়। পারিজাতবাবুর বউ ছিল দারুণ সুন্দরী আর খুব শিক্ষিতা।

আমি প্রতিমাকে একটু জ্বালাতন করার জন্যই বললাম, তাতে কী? সুন্দরীই তো গণ্ডগোল করে বেশি। হয়তো তার গোপন প্রেমিক ছিল।

মোটেই নয়।

খুনটা কি এখানে হয়েছিল?

না। কলকাতায়।

তা হলে এত ডিটেলস জানলেন কী করে?

শুনেছি।

শোনা কথার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দিতে হয়।

চা নিয়ে এলেন প্রতিমার মা। ভারী রোগা-ভোগা মানুষ। পরনে মলিন একখানা শাড়ি। প্রণাম করার সময় ওঁর পায়ে হাজা লক্ষ করলাম। লাজুক মানুষ। চা দিয়ে শুধু বললেন, তোমরা বসে গল্প করো। বলেই চলে গেলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম, প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। অত্যন্ত বাজে সস্তা চা-পাতায় তৈরি কাথটি আমি প্রতিমার সুশ্রী মুখখানা দেখতে দেখতে খেয়ে নিলাম। ওই অনুপানটুকু না থাকলে চা গলা দিয়ে নামত না।

পারিজাতের বউকে ছেড়ে প্রতিমা অন্য প্রসঙ্গ তুলল, আচ্ছা, হায়ার সেকেন্ডারিতে আপনি নাকি দারুণ রেজাল্ট করেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে বলল?

সব জানি। চারটে লেটার। আপনি কি নকশাল ছিলেন?

ও বাবা! অনেক জানেন দেখছি!

জানিই তো। লোকে বলে আপনি ডেনজারাস ছেলে ছিলেন।

আমি বললাম, ডেনজারাস জেনেও বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াচ্ছেন?

আপনাকে দেখে মোটেই ডেনজারাস মনে হয় না।

তা হলে কী মনে হয়?

বললাম তো, ডেনজারাস মনে হয় না।

সেটা তো নেতিবাচক গুণ। অস্তিবাচক কিছু বলুন।

মোটে তো আলাপ হল। কদিন দেখি, তারপর বলব।

আমি একটু হতাশার গলায় বললাম, দেখবেন কী করে? আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাব।

কেন, ফিরে যাওয়ার কী হল? চাকরি তো পাচ্ছেনই।

চাকরিটা বরং আপনিই করুন। স্কুলের চাকরির সঙ্গে পারিজাতের জীবনী লেখার পার্টটাইম জব। ভালই হবে।

হঠাৎ প্রতিমার মুখখানা ফ্যাকাসে দেখাল। কথাটা বলা হয়তো ঠিক হয়নি। প্রতিমা কিছুক্ষণ মন দিয়ে নিজের হাতের পাতা দেখল। তারপর বলল, একটা মেয়ে বেকার থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা ছেলে বেকার থাকলে ভারী কষ্ট।

কথাটা শুনে মেয়েটাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লেগে গেল। সুস্থির চিন্তা ও স্নিগ্ধ মন ছাড়া এরকম সিদ্ধান্তে আসা বড় সহজ নয়। বিশেষ করে তেমন মেয়ের পক্ষে, যে দরিদ্র পরিবারে মানুষ হয়েছে এবং সংসারের প্রয়োজনেই যার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে চাকরিটা পাওয়া দরকার। আজকাল অনেক বড়লোকের বউ বা মেয়ে স্কুল, কলেজ, অফিসের নানা চাকরি দখল করে বসে আছে। তাদের অর্থকরী প্রয়োজন নেই। নিতান্ত সময় কাটানোবা গৃহ থেকে মুক্তিই তাদের উদ্দেশ্য। এরা যদি জায়গা ছেড়ে দিত তা হলে এই গরিব দেশের অনেকগুলো পরিবার বেঁচে যেত।

প্রতিমার এই কথায় ভিতরে ভিতরে একটা আবেগের চঞ্চলতা অনুভব করছিলাম। সেটার রাশ টেনে একটু উদাস গলায় বললাম, আপনার মতো করে তো সবাই ভাবে না।

প্রতিমা মাথা নিচু করে হাসিমুখে বলল, আমার এমনিতেও চাকরিটা হত না। আমার হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট ভাল নয়।

কিন্তু আপনি যে বি এড, নতুন আইনে বি এড ছাড়া নাকি কাউকে চাকরি দিচ্ছেই না।

আপনাকে দেবে। শুনেছি আপনি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট।

আপনি অনেক কিছু শোনেন তো?

প্রতিমা সরল হাসিমুখে বলে, আমার চাকরির জন্য বাবা এত বেশি অ্যাংশাস যে, আপনার সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। আজ ভোরবেলা কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললেন, তোর হবে না রে। ওই ছেলেটা অসীমার ক্যান্ডিডেট।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনি যা শোনেন তার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দেবেন। আমি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট নই। উনি আমাকে ভাল করে চেনেনও না। তবে একজন মিডলম্যান কিছু তদবির করেছিল। তাতে তেমন কিছু কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না।

কারণ অসীমাদি খুবই অন্যমনস্ক আর বিমর্ষ ছিলেন সেদিন। আমার হয়ে উনি খুব একটা লড়ালড়ি করবেন না। ওঁর বোধহয় মুড নেই।

লড়ালড়ি করতে হবে না। উনি একবার বললেই হবে। পারিজাতবাবুর কাছে অসীমাদির প্রেস্টিজই আলাদা।

আপনি তা হলে আমার কাছে হেরেই বসে আছেন!

হারতেই যখন হবে তখন আগে থেকে হার মেনে নেওয়াই ভাল।

আমি একটা বড় শ্বাস ফেলে বললাম, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

কী আন্দাজ করেছিলেন?

আপনি একটু সেকেলে। এখনকার মেয়েরা চাকরির জন্য জান লড়িয়ে দেয়।

জান লড়িয়েও আমার লাভ নেই। অসীমাদির ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে পারব কেন!

আপনার বাবাও কি হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনার মতো?

এ কথায় প্রতিমা খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, বাবা একটু কীরকম যেন আছে। কে যেন বাবার মাথায় আইডিয়া দিয়েছে যে, চাকুরে মেয়েদের ভাল বর জুটে যায়।

আমি বললাম, কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। বিবাহযোগ্য যুবকেরা এখন ওয়ার্কিং গার্লই প্রেফার করছে। এখনও ভেবে দেখুন লড়বেন কি না।

লড়ার ইচ্ছে থাকলে আর এতক্ষণ বসে আছি! বাবা বলে গেছে, আজ সকালে যেন পারিজাতবাবুর কাছে একবার যাই। উনি নাকি ডেকেছেন। কিন্তু আমি যাইনি।

গিয়ে কী হত?

তা কে জানে! পারিজাতবাবুর হয়তো কিছু জানার ছিল।

প্রতিমার জন্য আমার একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। পারিজাতের বাড়িতে ওকে পাঠানোর পিছনে জহরবাবুর কোনও অদ্ভুত উদ্দেশ্য নেই তো! থাকলেও অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। প্রতিমা আমার কেউ নয়, জহরবাবুরই আত্মজা। ওর ভালমন্দ উনিই বুঝবেন। তবু মনটায় একটা খিচ থেকেই গেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, পারিজাতের সঙ্গে অসীমা দিদিমণির বিয়ের কথা কি একদম পাকা?

ওমা! পাকা নয়তো কী? খুব অবাক হয়ে প্রতিমা বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বিয়েটা যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না। হয়তো কোনও কারণে বিয়েটা ভেঙে গেল।

কী কারণ?

ধরুন যদি সে কারণ আপনিই হন!

আমি?–প্রতিমা আকাশ থেকে পড়ে বলে, আমি কীসের কারণ? যা!

কথাটা হঠকারিতাবশে বলে ফেলে আমি একটু বিপদেই পড়লাম। প্রতিমা সিধে-সরল মানুষ। বোধহয় সহজেই ঘাবড়েও যায়। মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি সাহস করে বললাম, আপনিই বলেছিলেন পারিজাত ভাল লোক নয়, খুন করারও অভ্যাস আছে। ওর কাছে কোনও যুবতী এবং সুন্দরী মেয়ের কি একা যাওয়া ভাল?

প্রতিমার মুখের আহত ভাবটা রয়েই গেল। বলল, কিন্তু আপনি তো সে ইঙ্গিত করেননি। একটা খুব বাজে কথা বলেছেন। কেন বললেন?

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, মনে হল, তাই বললাম।

প্রতিমা অত্যন্ত অকপটে বলল, আপনি খুব খারাপ।

আমার চেয়েও খারাপ লোক আছে।

প্রতিমা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। ওর চোখে টলটল করছে জল। তবু আমার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে আমি ওর উপকারই করেছি। সরল মেয়ে, হয়তো দুনিয়ার প্যাঁচ খেচ তেমন ভাল জানে না। যদি আমার কথায় সচেতন ও সতর্ক হয় তবে ভালই হবে।

কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে বাইরে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার চাকরির আর দরকার নেই। তাই পারিজাতবাবুর কাছে যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পারিজাতবাবুর কাছে গেলেই যে মেয়েরা বিপদে পড়ে একথা আপনাকে কে বলল? ওঁর কাছে নানা কাজে কত মেয়ে যাচ্ছে।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আহা, কথাটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন?

কথাটা আপনি বললেন কেন তা হলে?

আর বলব না।

আপনি ভীষণ খারাপ। বলতে বলতে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল এবং কোনও কথা না বলেই ভিতরবাড়িতে চলে গেল হঠাৎ।

কী আর করা! বেকুবের মতো মিনিটখানেক বসে থেকে আমি ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রতিমাকে একটা কথা বলে আসার সুযোগ হল না। নইলে আমি বলতাম, আমি খারাপ বটে, কিন্তু আপনি ভাল। বেশ ভাল। এরকম ভাল থাকারই চেষ্টা করবেন।

সিংহীবাড়িটা পেরোনোর সময় খোলা ফটক দিয়ে দূরে গাড়িবারান্দার কাছে একটা জিপগাড়ির মুখ দেখতে পেয়ে আমি ব্রেক কষি। পারিজাত হয়তো কোথাও গিয়েছিল,

ফিরেছে। নয়তো কোথাও যাবে। আমি খুব কিছু চিন্তাভাবনা না করে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে খোলা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

ভিতরে ঢুকে দেখি, একটা নয়, দুটো জিপ এবং একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িবারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গাড়িতেই ত্রিসিংহ মার্কা দেখলাম। অর্থাৎ সরকারি গাড়ি।

আজ সিঁড়ির মুখেই দারোয়ান। আমি সাইকেল গাড়িবারান্দার তলায় থামাতেই সে বলল, এখন দেখা হবে না। জরুরি মিটিং হচ্ছে।

বাইরের ঘরের দরজা আঁট করে বন্ধ। বেশ হাই লেভেলের গুরুতর সলাপরামর্শ হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি একটু উগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভিতরে কে কে আছে?

দারোয়ানটা এমনিতে হয়তো আমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেদিন সে বোধহয় সকালে আমাকে পারিজাতের সঙ্গে দৌড়োত দেখেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কতটা তা আন্দাজ করা তার পক্ষে মুশকিল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আর ফুড অফিসার। আরও কয়েকজন আছে।

আমি সাইকেলটা গাড়িবারান্দার ধারে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বললাম, ঠিক আছে, মিটিং শেষ হোক। আমি বাগানে অপেক্ষা করছি।

দারোয়ান কিছু বলল না।

সিংহীদের বাগান বরাবর আমাকে আকর্ষণ করত। আজও করে। পারিজাতকে ধন্যবাদ যে, বাগানটায় সে হাত দেয়নি। যেমন ছিল প্রায় তেমনই রেখে দিয়েছে। অলস পায়ে আমি বাগানটায় ঘুরতে লাগলাম। সিংহীরা ককর বালি আর কী কী সব মিশিয়ে বাগানের তলায় জলনিকাশি ব্যবস্থা করেছিল। এই ভারী বর্ষাতেও তাই বাগানে তেমন জল দাঁড়ায়নি। তবু চটিজোড়া ভিজে যাচ্ছিল। হাওয়াই চটি ভিজলেই পিছল হয়ে যায়। হাঁটতে

অসুবিধে বোধ করে আমি একটা কুঞ্জবনে ঢুকে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। রোদটাও বড্ড চড়চড় করছে।

হাতের কাছে যে কুঞ্জবনটা পাওয়া গেল সেটায় ঢুকেই থমকে যাই। ভিতরের আবছায়ায় একটা মেয়ে বসে আছে। সেই মেয়েটিই, যে আমাকে সেদিন মোটেই আমল দেয়নি। কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন গা ছেড়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে। চোখদুটো বোজা। আমাকে টের পায়নি। কুঞ্জবনে ঢুকবার মুখটায় দাঁড়িয়ে আবছায়াতেই আমি মেয়েটিকে লক্ষ করি। সম্ভবত ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। মুখে এক ধরনের লালসা ও নিষ্ঠুরতা আছে। স্বভাব যে উগ্রতা ওর মুখের হাঁটকাট দেখেই বোঝা যায়। এসব মেয়েরা শরীরকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি সম্পর্কে পর পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিই। আমার একটুও ভয় করছিল না। কারণ ভয় জিনিসটা আমার সহজে হয় না। মেয়েদের সম্পর্কেও আমার অনাবশ্যক ও বাহুল্য কোনও স্পর্শকাতরতা বা সংকোচ নেই। কেউ আমাকে অপমান করতে পারে ভেবেও আমি অস্বস্তি বোধ করি না। এক কথা, আমি বিস্তর অপমান হজম করতে পারি। দ্বিতীয়ত, পালটা অপমান করতেও আমি পিছপা নই।

মেয়েটি তাকাল, কিন্তু চমকাল না। সম্ভবত খুব গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। সেই ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে পুরোপুরি ফিরে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। তারপর আমাকে দেখল মেয়েটি এবং কিছুক্ষণ চেনার চেষ্টা করল। তারপর অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল, এখানে কী চাই?

এই প্রশ্নটার জবাব তৈরি করার জন্য আমি অনেকটা সময় পেয়েছি। কিন্তু জবাবটা তৈরি হয়নি। সাদামাটা জবাব দিয়ে লাভও নেই। মেয়েটি কিছু অদ্ভুত। সাধারণ মেয়েরা এরকম পরিবেশে অচেনা কাউকে আচমকা দেখলে চমকায় এবং কে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এ মেয়েটা একটুও চমকায়নি বা কে বলে চেঁচায়নি। বরং অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করেছে

এখানে কী চাই। এই প্রশ্নের মধ্যেই দুটো বক্তব্য রয়েছে। এক হল, এটা তোমার জায়গা নয়। দ্বিতীয় হল, এখানে এসে তুমি অন্যায় করেছ, কেটে পড়ো।

এসব অভদ্র মেয়ের কাছে বিনীত হওয়ার কোনও মানেই হয় না। আমি পালটি দেওয়ার জন্যই কুঞ্জবনটায় ঢুকে চারধারে খুব কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরিব্বাস! দারুণ জায়গা তো! একেবারে কুঞ্জবন!

মেয়েটা নিশ্চয়ই এরকম ব্যবহার আশা করেনি। বড় বড় চোখ করে অপলকে আমাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, এটা বাইরের লোকেদের জন্য নয়। আপনি বারান্দার বেঞ্চে গিয়ে বসুন।

আমি বোকার মতো বললাম, কেন, এখানেও তো দিব্যি বেঞ্চ আছে। এখানে বসা যায় না!

মেয়েটা যথেষ্ট রেগে যাচ্ছে। কিন্তু দুম করে কোনও বোমা ফাটল না। খুব হিসেবি চোখে আমাকে মাপজোক করল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পাগল? দেখছেন তো, আমি এখানে বসে আছি।

আমি বোকা ও সরল সেজে বললাম, আপনি কি এ বাড়ির লোক?

হ্যাঁ। কেন? ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

আমি ক্যাবলার মতো হেসে বললাম, ও, তাই বলুন। নইলে অত চোটপাট করবেনই বা কেন? আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম, আপনিও বুঝি আমার মতো কোনও কাজে এসেছেন পারিজাতবাবুর কাছে।

আমার বোকা ও সরল ভাবটা বোধহয় বিশ্বাস করল মেয়েটা। একটু ভিজলও মনে হয়। গলা এক পা নামিয়ে বলল, উনি আমার দাদা। আপনার ওপর কি আমি খুব চোটপাট করেছি?

আমি ক্যাবলা ভাবটা ধরে থেকেই ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, তাতে কিছু না। যেখানেই যাই সেখানেই লোকে ধমক চমক করে কথা বলে আজকাল। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

আপনাকে সবাই ধমকায় বুঝি? মেয়েটা এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসে।

আমি হেঁ হেঁ করতে করতে বলি, আজকালকার যুগটাই পড়েছি অমনি। কারও মেজাজ ঠিক নেই।

মেয়েটা একটু সরে বসে পাশে অনেকটা জায়গা কঁকা করে দিয়ে বলল, বসুন।

আমি বসলাম।

আগের দিন মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। আজ বসবার সময় কাছাকাছি হতে আচমকা মনে হল, সিথিতে লালমতোকী যেন একটু দেখা গেল। সিঁদুরও হতে পারে, বা লিপস্টিক কিংবা কুমকুম জাতীয় কিছু যা আজকালকার বিবাহিতা মেয়েরা সিদুরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে ভালবাসে।

সরল এবং বোকা সাজার কতগুলো সুবিধে আছে। মেয়েটা যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকে যে, আমি নিতান্তই হাবাগোবা গোছের, তা হলে আমি যতই অনভিপ্রেত প্রশ্ন করি না কেন, চটবে না।

আমি বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলে বললাম, আপনি কি এ বাড়িতেই থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনার বিয়ে হয়নি?

মেয়েটা শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, নে, হাতে পাত্র আছে নাকি?

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েটা চটছে না। বোকা বলেই ধরে নিয়েছে। অপ্রতিভ ভাব করে বললাম, আজ্ঞে না। কত বড় মানুষ আপনারা। বড় বড় সব পাত্র আসবে আপনাদের জন্য।

মেয়েটা চুপ করে কুঞ্জবনের আবছায়ায় আমাকে একটু দেখল। তারপর বলল, আপনাকে দেখে তো খুব বোকা মনে হয় না!

আমি জিব কেটে বললাম, কী যে বলেন! গায়ের লোক, বোকা ছাড়া আর কী?

আপনার কোন গাঁ?

মউডুবি আজ্ঞে। বেশি দূর নয়।-বলেই মনে মনে ভাবলাম, অতি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে না তো! এত আজ্ঞে আজ্ঞে করে যারা কথা বলে তারা আমার মতো পোশাক পরে না।

দাদার কাছে আনার কীসের কাজ?

আমি মাস্টারির কথাটা চেপে গেলাম। কারণ সেটা বললে আবার লেখাপড়ার কথাটাও উঠে পড়বে। বললাম, এই ছোটখাটো যা হোক একটা কিছু কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছি। পারিজাতবাবুর তো মেলা জানানো।

গাঁয়ের ছেলে, চাষবাস করেন না কেন?

জমিই নেই।

কী হল?

বিক্রিবাটা, জবর দখল এসব নানারকম হয়ে বেহাত হয়ে গেছে।

চলে কী করে?

চলছে না বলেই তো হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছি।

লেখাপড়া কতদূর?

ওই স্কুলটা কোনওরকম ডিঙিয়েছিলাম।

বয়স তো বেশি নয়। পড়লেই তো পারেন।

আর পড়ে কী হবে? শুধু পয়সা খরচ। পড়ে কাজও পাওয়া যায় না।

মেয়েটা আলস্যের বশে একটা হাই তুলে বলল, বেশি লেখাপড়া অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবে গ্র্যাজুয়েটটা হলে চাকরির অনেক সুযোগ আসে।

আমি হেসে বললাম, গ্র্যাজুয়েট হতে একটু এলেম লাগে।

আপনার সেটা নেই?

না। আমার মাথাটা চিরকালই একটু মোটা।

মেয়েটা খুশিয়াল একটা খিকখিক হাসি হেসে বলল, আমারও তো মাথা মোটা। লেখাপড়া আমারও বেশিদূর হয়নি।

আমি উদাস গলায় বললাম, আপনাদের তো দরকার করে না। টাকা আছে।

মেয়েটা বড় বড় চোখে অবাক ভাব ফুটিয়ে বলে, কে বলল দরকার করে না? লেখাপড়া না শিখলে ভাল বর জোটে না তা জানেন?

আমি নিশ্চিন্তির গলায় বললাম, আপনার মতো সুন্দর মেয়েদের আবার বরের ভাবনা!

ও বাব্বা! কমপ্লিমেন্ট দিতেও জানেন দেখছি! খুব বোকা তো নন।

ঠিক বোকা নয়, তবে গেঁয়ো বটি। রাগ করলেন না তো!

ওমা! প্রশংসার কথায় রাগ করব কেন?

আমি উদাস গলায় বলি, আজকাল ভাল কথাতেও অনেক মেয়ে চটে যায়। গেলবার শীতকালে একবার বাসে বাসেরগঞ্জে যাচ্ছিলাম। একটা সুন্দরমতো মেয়ে দেখি হাতকাটা ব্লাউজ পরে জানলার ধারে বসা। বেশ ঠান্ডা হাওয়াও মারছিল সেদিন। অনেকক্ষণ দেখে থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, দিদি, আপনার শীত করছে না? ও বাবা, এমন রেগে গেল এই মারে কি সেই মারে!

বানিয়ে বলা। মেয়েটা তবু ক্ষীণ একটু হাসল। বলল, ছেলেদেরও অনেক দোষ আছে। মেয়েদের চোখে পড়ার জন্য তারা অনেক বোকা-বোকা কাণ্ড করে।

ইঙ্গিতটা আমার প্রতিই কি না তা বুঝতে না পেরে আমি সরলভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ্ঞে, কথাটা আমাকে মনে করেই বলছেন না তো!

মেয়েটা আমাকে একবার তেরছা চোখে দেখে নিয়ে বলে, আপনি একটু গায়ে পড়া বটে, কিন্তু এখনও তেমন কিছু কাণ্ড করেননি। আমি আর একটা ছেলের কথা জানি। প্রফেসর। লেখাপড়া নিয়ে দিব্যি ছিল। হঠাৎ একটা মেয়েকে খুশি করতে ব্যায়াম শুরু করল। তাতে তার গায়ে ইয়া ইয়া গুলি ফুটে উঠল বটে, কিন্তু মাথাটা গেল মোটা হয়ে। মেয়েটাও পালোয়ান প্রফেসরকে তেমন পছন্দ করতে পারছিল না। তারপর সে কী করল জানেন? গান আর নাচ শিখতে লাগল।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, বলেন কী? একটা মেয়ের জন্য এত মেহনত? লোকটা মাইরি আমার চেয়েও বোকা আছে। কে বলুন তো?

মেয়েটা মাথা নেড়ে মুখ টিপে হেসে বললে, সব ছেলেই ওইরকম। কিছু কম আর বেশি।

আমি বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, আমার অত মেহনত কিছুতেই পোষাত না।

মেয়েটা একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, কেন? মেয়েরা কি ফেলনা যে তাদের খুশি করার জন্য কিছু করতে নেই পুরুষদের!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক তা বলিনি। তবে যার কথা বললেন সে আদত পুরুষই তো নয়। একটা মেয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর লোকটা বাঁদরের মতো নেচে যাচ্ছে।

মেয়েটা এবার আর একটু রেগে গেল যেন। ঝামরে উঠে বলল, বেশ করছেনাচছে। ভালবাসার জন্য সবকিছু করা যায়।

আমি বললাম, এই যে বললেন বোকা-বোকা কাণ্ড!

মেয়েটা তেজের সঙ্গে বলে, মোটেই বোকা-বোকা কাণ্ড নয়। লোকটা সত্যিকারের পুরুষ বলেই পেরেছে। সে অলস নয়, অকর্মা নয়, অক্ষম নয়। একজন মেয়ের প্রেমে তার সুপ্ত সব প্রতিভা জেগে উঠেছে।

এবার আমি হাঁ করে রইলাম। গোলমালটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। আবছা মনে হচ্ছিল, সেই বোকা লোকটার নায়িকা বোধহয় এ মেয়েটা নিজেই। তাই চট করে স্ট্র্যাটেজি পালটে নিয়ে বললাম, অবশ্য আপনার মতো একজন মেয়ের জন্য অনেক কিছু করা যায়। ব্যায়াম, নাচ, গান, সব কিছু

মেয়েটা আমার কথা শুনল বলে মনে হয় না। কেমন কুটিকুটিল এবং চিন্তান্বিত মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে। বেশ কিছুটা সময় চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছু পেতন আর শাঁকচুন্নি সেই ছেলেটার পিছনে লেগেছে। কেন যে মেয়েগুলো এমন হ্যাংলা।

বলেই মেয়েটা একটু সচকিতভাবে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বলল, কিছু মেয়ে এরকম থাকেই। তাই না? তবে জেনারেলি ছেলেরাই হ্যাংলামো বেশি করে। পেতনি আর শাকচুনিগুলোকে কী করা যায় বলুন তো!

আমি একগাল হেসে বললাম, ঝাটাপেটা করুন। কষে ঝাটা মারুন।

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, তাই মারব। খবর পেয়েছি গন্ধর্ব এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছে। যাওয়াচ্ছি! এমন কুরুক্ষেত্র করব এবার।

বলতে বলতে মেয়েটা আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ঝটকায় উঠে ঝম করে চলে গেল।

আমি বসে বসে কিছুক্ষণ আমার বিদীর্ণ মস্তিষ্কের টুকরোগুলো জোড়া দিলাম। একটা ছক বা পড়ল। খুব একটা জটিল ছক নয়।

বসে আছি, হঠাৎ দারোয়ান এসে এত্তেলা দিল, বাবু ডাকছেন।

আমি একটু অবাক হলাম। বাবু অর্থাৎ পারিজাতের আমাকে ডাকার কথাই নয়। কারণ, আমি যে এসেছি তা সে জানে না। উপরন্তু আমি উমেদার। আমাকে এড়ানোর চেষ্টাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম।

পারিজাত বাইরের ঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে বলে ওঠে, আরে তুমি!

আমিও আকাশ থেকে পড়ে বললাম, কেন, আপনিই তো দারোয়ান দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন!

পারিজাত হেসে ফেলল। বলল, তুমিই এতক্ষণ কমার সঙ্গে কুঞ্জবনে বসে ছিলে? কী আশ্চর্য!

এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

পারিজাত আমার দিকে নতুন এক আবিষ্কারকের চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি তো দেখছি মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ। রুমা আমাকে কী বলে গেল জানো?

না। কী করে জানব?

বলে গেল, কুঞ্জবনে একটা ছেলে বসে আছে। ভারী ভাল ছেলে। একটু বোকা, কিন্তু খুব সরল। ও যে কাজের জন্য এসেছে সেটা যেন ওর হয়।

আমি বললাম, তাই নাকি?

শুধু তাই নয়। এইমাত্র জহরবাবুর ছোট ছেলে প্রতিমার একটা চিরকুট দিয়ে গেল। পড়বে সেটা? পড়ো।–বলে পারিজাত একটা রুলটানা এক্সারসাইজ বুকের ভাঁজ করা পাতা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি চিঠিটা খুলি। প্রতিমার হাতের লেখা ভালই। লিখেছে, পারিজাতবাবু, আমার চাকরির দরকার নেই। দয়া করে চাকরিটা অভিজিৎবাবুকেই দেবেন। উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আমার বাবা হয়তো ব্যাপারটা সহজে বুঝতে চাইবেন না। আমাদের তো অভাবের সংসার। তবু আমার মনের ইচ্ছেটা আপনাকে অসংকোচে জানালাম।

প্রণাম জানবেন। প্রতিমা।

পারিজাত আমার মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। চিঠি পড়া শেষ হতেই একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তিন-তিনটে জোরালো রেকমেনডেশন। অসীমা, রুমা, প্রতিমা। মেয়েদের সাইকোলজি তুমি বোধহয় খুব ভাল বোঝো।

আমি একটু লজ্জা পেলাম। বাস্তবিক গোটা ব্যাপারটা যে এইভাবে আমার অনুকূলে এসে যাবে তা আমি আশা করিনি। আমি মিনমিন করে বললাম, কিন্তু এতে আমার কোনও হাত নেই।

পারিজাত অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? যারা রেকমেন্ড করেছে তারা কারা জানো? একজন আমার ভাবী স্ত্রী, একজন আমার মায়ের পেটের বোন এবং তৃতীয় জন তোমার সবচেয়ে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী। এই তিনজন মহিলাকে হাত করা খুব সহজ ব্যাপার তো নয়।

আমি কোনও জবাব খুঁজে পেলাম না। শুধু হাসলাম।

পারিজাত বলে, রুমা তোমার সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট দিয়ে গেল সেটাও অদ্ভুত। তুমি নাকি খুব বোকা এবং সরল। ওকে এই টুপিটা কী করে পরালে? তোমাকে দেখে তো বোকা বা সরল কিছুই মনে হয় না।

উনি নিজে ভাল বলেই বোধহয় আমাকে ভাল বলেছেন।

রুমা ভাল? এই প্রশ্ন করে পারিজাত ওপরে তুলে আমাকে নিরীক্ষণ করে বলে, ওরকম গেছো মেয়ে খুব কম আছে। নিজের পছন্দ করা বরকে দু'দুবার ডিভোর্স করেছে, তা জানো?

না। অতটা জানি না। তবে উনি গন্ধর্ব নামে কে একজন অধ্যাপকের কথা বলছিলেন।

সেই গন্ধর্বই। বেচারা হয়রান হয়ে গেল মেয়েটার জন্য। গন্ধর্ব সম্পর্কে কী বলছিল তোমাকে?

কয়েকজন পেতনি আর শাকচুন্নি নাকি গন্ধর্বর পিছনে লেগেছে। উনি খুব জেলাসি ফিল করছেন।

করছে?–পারিজাতের মুখ উজ্জ্বল হল, যাক বাবা। ইট ইজ এ ড্যাম গুড নিউজ। কোনও প্ল্যান করছে বলে বলল নাকি?

না। উনি আমার সাজেশন চাইছিলেন। আমি সাজেস্ট করেছি পেতনি আর শাঁকচুন্নিদের ঝাটা মেরে তাড়াতে।

বুব হাসল পারিজাত। হোঃ হোঃ করে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, তাই বোধহয় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ভাবগতিক দেখেই বুঝতে পেরেছি একটা কিছু ঘটিয়ে আসবে। যাক, বাঁচা গেল। তা তুমি এখনও এই মাস্টারির চাকরিটা চাও?

আমি অবাক হয়ে বলি, চাইব না কেন?

পারিজাত মাথা নেড়ে বলে, তোমার যা প্রতিভা তা এই সামান্য চাকরিতে নষ্ট করবে কেন? ইচ্ছে করলে নিজের যোগ্যতায় অনেক ওপরে উঠে যেতে পারবে। এমনকী, আমার তো মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় বলি, আগে তো মাস্টারিটাই হোক।

হোক মানে! এরপরও না হলে আমাকে কেউ আস্ত রাখবে নাকি! কিন্তু ভাই, আমার ওপর এই ত্রিমুখী আক্রমণ চালানোর কোনও দরকার ছিল না। তিন-তিনটে ভাইটাল রেকমেনডেশন কি সোজা কথা!

# ৭. পারিজাত

সংকীর্ণ পার্বত্যপথে দুদিক থেকে দুজন সশস্ত্র অশ্বারোহী ছুটে আসছে। সামনেই এক উপত্যকা। সেইখানে দুজনের দেখা হবে। শুরু হবে দ্বৈরথ। দুজনের মধ্যে যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হয় ততক্ষণ চলবে মরণপণ লড়াই। অস্ত্রে অস্ত্রে ধুন্ধুমার শব্দ উঠবে। অশ্বক্ষুরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে চারদিক। ঝরে পড়বে রক্ত ও স্বেদ। না, লড়াই এখনও শুরু হয়নি। তবে অমোঘ লক্ষ্যে এখন ছুটে যাচ্ছে নিয়তিনির্দিষ্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

বলাই বাহুল্য এই দুই অশ্বারোহীর একজন আমি, অন্যজন অধর। আমাদের দুজনের কারওরই ঘোড়া নেই, তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তরোয়াল নেই, টাকা আছে। দ্বৈরথ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। আজকাল লড়াই হয় কূটনৈতিক চালে। কিন্তু লড়াই আসন্ন।

চাংড়াপোঁতার বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার কাগজে ছোট করে বেরিয়েছে সংবাদ। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। বর্ষাকালে ফি বছরই এই রাজ্যের কয়েকটা জেলা ও অঞ্চল ভাসে। কথা হল, চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ মেরামতির ঠিকা গতবছর অধরকেই দেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়তো পুরনো রেকর্ড ঘাঁটতে চাইবেন না, তাই আমি তথ্যটি যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে তার গোচরে এনেছি। যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় তাহলে ঘটনাটিকে সাধারণ্যে রটনার একটি প্রচ্ছন্ন হুমকিও তাকে আমি যথাযথ বিনয় সহকারে দিয়ে দিতে ভুলিনি। বাঁধ মেরামতি বাবদ খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকার কাছাকাছি। খুব কম নয়। জনসাধারণের টাকা। কিন্তু জনসাধারণ তাদের টাকা কোথায় কীভাবে নয়ছয় হচ্ছে সে বিষয়ে খুবই নির্বিকার। সুতরাং আমাকেই তাদের প্রতিনিধি হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে।

জাতসাপটা পছন্দ করছে না, তবু আমি বারবারই তার লেজ দিয়ে কান চুলকোচ্ছি! সাপটা রাগছে, ফুঁসছে। এবার ছোবল তুলবে। অধর।

একটা রিকশা এসে থামল আমার গাড়িবারান্দার তলায়। কমলা সেন নামলেন। ভোরের কোমল আলোয় তাকে নম্র দেখাচ্ছিল। যৌবনে শ্রীময়ী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখন কিছু মেদ ও মেচেতার সঞ্চারে চটকটা ঢাকা পড়েছে। তার মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ বরাবর ছিল। এখনও আছে। স্বভাবে গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বময়ী এই মহিলাকে আজ কিছু শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরনে কমলা রঙের একখানা শাড়ি, চওড়া বাসন্তী রঙের পাড়। ওই রঙেরই মানানসই ব্লাউজ। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। এখনও অগাধ ও গভীর, বন্যার মতো এক ঢল চুল তার মাথায়। এলোখোঁপায় বাঁধা। হাতে একটা বড়সড় ফোলিও ব্যাগ।

পর্দা সরিয়ে চৌকাঠে তিনি দেখা দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললাম, আসুন, আসুন।

এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে কোনও অবিনয় বা কৃত্রিমতা নেই। খাঁটি লোকদের আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করি। দেশে এরকম লোকের সংখ্যা বড়ই কম। কমলা সেন শিবপ্রসাদ হাইস্কুলের জন্য যা করেছেন তা এখন প্রায় কিংবদন্তী।

দরজা থেকে টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে কমলার অনেকটা সময় লাগল। পদক্ষেপ ধীর, অবিন্যস্ত, কুণ্ঠিত। যেন বা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। কেন এখানে এসেছেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিতেও সেরকম একটা অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল, যা ওঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়।

উনি যতক্ষণ কাছে এসে না বসলেন ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দুজনেই বসলাম মুখোমুখি। কিন্তু কেউ কারওদিকে সহজভাবে তাকাতে পারছিলাম না। কমলা সেন নীরবে তার কোলের ওপর রাখা ফোলিও ব্যাগ এবং তার ওপর রাখা তার হাত দুখানি কিংবা মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। আমি ওঁর সিথির ওপর দিয়ে, খোঁপার কিনারা ছুঁয়ে দৃষ্টিটাকে মোটামুটি স্থির রাখলাম দরজার দিকে।

ঘর ফাঁকা। শব্দ নেই। বাইরে শুধু পাখির ডাক।

আমরা দুজন অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছি। আমাদের আন্ডারস্ট্যানডিং খুবই ভাল। যতদূর জানি আমাকে উনি সেক্রেটারি হিসেবে পছন্দই করতেন, যেমন আমি করতাম ওঁকে হেডমিসট্রেস হিসেবে। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানই চিরকাল একভাবে চলে না। চলতে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও বিবর্তন ঘটে। ঘটা দরকারও। পরিবর্তন যদি না ঘটত তা হলে আমি দারিদ্র্যসীমার ওপাশ থেকে চিরকাল এপাশে আসার স্বপ্নই দেখতাম। সত্যিকারের আসা হত না কখনও।

মৃদুস্বরে বললাম, ভাল তো?

চশমার কাঁচ ও ফ্রেমে একটু আলো ঝিকিয়ে উঠল, হ্যাঁ। আপনি?

চলে যাচ্ছে।

আবার নিস্তব্ধতা। শুধু অজস্র পাখির ডাকে ভরে উঠল ঘর। সকালের কোমল আলোর এক মায়া ঘরের মধ্যে সম্মোহন বিস্তার করে দিচ্ছে। আমরা কেউ কখনও কাউকে তেমন অপছন্দ করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছিল না। শত্রুতা নয়। আজও কি অপছন্দ হবে না পরস্পরকে?

কমলা সেন মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ তুললেন না। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, খুব খাটুনি যাচ্ছে তো, আগেকার মতো?

খাটতে তো হয়ই। আপনিও তো বিশ্রাম নেন না।

আমার তো ছোট্ট জায়গা নিয়ে কাজ। আপনার তো তা নয়। টেনশন হয় না?

হয়।

বলে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করি। কমলা আমাকে ঘৃণা করতে পারছেন না। সেটা ঘটে ওঠা সম্ভব বলে আমারও মনে হয়নি কখনও। তবু আশা করেছিলাম, শেষ অবধি

আমাকে উনি ঘৃণা করতে পারবেন। পারেননি। মৃদুস্বরে বললাম, ডানহাতে একটা সোনার বালা ছিল বরাবর। আজ দেখছি না।

কমলা চকিতে একবার তাকালেন। চোখ নামিয়ে নিজের শূন্য ডান হাতখানি ঘুরিয়ে দেখলেন একটু। বললেন, পুরনো হয়ে গিয়েছিল।

ভেঙে গড়তে দিয়েছেন?

উনি মাথা নাড়লেন, না। রেখে দিয়েছি।

একটু হাসলাম। ডান হাতখানা বড় শূন্য দেখাচ্ছে। বৈধব্য যেমন দীর্ঘ ও সাদা।

চা?

চশমার কাঁচ ও ফ্রেমে আবার একটু ঝিলিক, হু।

ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করলাম ওঁর কাছে। ওই হু-টুকুর বড় প্রয়োজন ছিল আজ। টেবিলের গায়ে লাগানো কলিং বেল-এ ওপরের রান্নাঘরে চায়ের সংকেত পাঠিয়ে দিই। ওরাই দেখে যাবে কজন এবং ক কাপ। আমি মুখে উদাস ভাব মেখে বসে থাকি। একটু পিছনে হেলে, গা ছেড়ে।

নীরবতা। পাখির ডাক। কোমল আলো।

চা আসে। দুজনেই মৃদু চুমুক দিই। কমলা একটু এদিকে তাকান, একটু ওদিকে। কিছু দেখছেন না, জানি। নিজেকে স্থির করছে। আমাকে ঘৃণা করতে পারলে ওঁর পক্ষে কাজটা সহজ হয়ে যেত। সোজা তাকাতে পারতেন আমার চোখের দিকে। সহজে বলতে পারতেন কিছু কঠিন কথা। পারছেন না।

ঠিক কথা, স্কুলটার জন্য আমার বিশেষ কোনও দরদ নেই। আমার ভাবপ্রবণতা কম। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছুতেই আমার কাছে জিয়ন্ত ও শরীরী কোনও সত্তা হয়ে ওঠে না।

স্কুলের প্রতিটি ইটের প্রতি ওঁর যেরকম ভালবাসা আমার তা কোটি বছরেও হওয়ার নয়। তবু আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেটেছি, যখন যেমন দরকার। এও ঠিক আমার আরও পাঁচ রকমের কারবার আছে। স্কুলের পিছনে আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিইনি। কিন্তু কমলা সেন তার অবকাশটিও স্কুলের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেছিলেন। এই স্কুলের জন্য আমার ব্যক্তিগত ত্যাগ বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওঁর অনেক আছে। বিদ্যায়তনে নাচগানের ক্লাস বসানোতে ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন তিনি, আমি সেই সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দিইনি। এই নিয়ে খটাখটিও হয়েছে। শেষ অবধি আমার বাস্তববুদ্ধিকে তিনি গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে করেননি। লেখাপড়া জিনিসটার প্রতি তামার বিরাগ চিরকালের। স্কুল-কলেজের নামে আমার এলার্জি হয়। অভিজ্ঞতাবলে আমি জানি কিছুটা লেখাপড়া ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে পেটভাতের জোগাড় করার মতো যোগ্যতা অর্জন আরও ঢের ভাল। তাই আমি স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই চাষবাস, গোপালন, ইলেকট্রিক, বা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, ট্যানারি, মৌমাছির চাষ, হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি, বাঁশ বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ঘর গেরস্থালির জিনিস বানানো ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা করার পক্ষপাতি ছিলাম। সবচেয়ে জোরালো বাধা দিয়েছেন উনি। তাতে নাকি ছেলেমেয়েরা বইয়ের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে। তাছাড়া ওসব তো কোর্সেও নেই। বহুবার বহু ব্যাপার নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে, বিতর্ক ঘটেছে। তবু কীভাবে যেন একটা গভীর আস্থাবোধও জন্ম নিয়েছিল।

কমলা সেন আমার কাছে হেরে গেছেন বা আমি জয়ী হয়েছি এমন কিছু আমার মনে হয় না। আমি জয়ী হলেও সেই জয়ের স্বাদ আমি উপভোগ করছি না। আমি ওঁরই জয় চেয়েছিলাম। উনি পারলেন না। সেটা হয়তো আমার পরাজয়ও।

চা শেষ হল। দুটি শূন্য পাত্র ও আমরা দুজন মুখোমুখি বসে রইলাম। শব্দ নেই। শুধু পাখি ডাকছে। আজ যে কোথা থেকে এত পাখি এল! না কি রোজই আসে, আমি হয়তো রোজ তাদের ডাক শুনতে পাই না। আজ পাচ্ছি।

কমলা সেন নতমুখে খুব ধীরে ধীরে, শব্দ না করে তার ফোলিও ব্যাগের চেন খুলছিলেন। কেন তা আমি জানি। ব্যাগের মধ্যে একটি চিঠি আছে। টাইপ করা এবং বেশি বড় নয়। ওঁর পদত্যাগপত্র।

আমি ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে আলোর কিছু প্রতিফলন লক্ষ করছিলাম। গত দুদিন বৃষ্টি নেই। চনমনে রোদ উঠেছে। চাংড়াপোতার বাঁধ ভাঙা ছাড়া কি এবারের বর্ষা আর কোনও দুর্দৈবের সৃষ্টি করতে পারল না? বন্যা হবে না তা হলে?

আমি ওপরের দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করি, কোথাও যাচ্ছেন নাকি বাইরে?

উনি চেনটা আধখোলা রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, যাচ্ছি। প্রথমে কলকাতায়। তারপর কাছেপিঠে কোথাও।

আমি মাথা নাড়লাম, অনেকদিন কোথাও যাননি। এবার একটু ঘুরে আসুন।

কথাটার মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই। সমবেদনা আছে। কমলা চুপ করে আমার টেবিলের সবুজ কাঁচে একটা নকশাদার পেপারওয়েটের প্রতিবিম্ব দেখলেন। তারপর বললেন, বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

আমি হাসলাম। বললাম, কাজ ছাড়া আপনার আর কবে কীই বা ভাল লাগল!

উনি সলজ্জ, হেসে খুব মৃদু স্বরে, প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে বললেন, এবার ছুটি।

আমি ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ওঁর খোঁপার সীমানা ছুঁয়ে দরজা দেখতে দেখতে বললাম, আমি শুনেছি, অনেকগুলো স্কুল থেকে অফার এসেছে আপনার কাছে।

উনি মাথা নাড়লেন, মুখে দুষ্টুমির ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু করব না।

কেন করবেন না?

করা উচিত নয় বলে। হাসিমুখেই বললেন কমলা, কেন তা তো আপনি জানেন।

জানি। সবই জানি। আমি কমলার চরিত্র বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছি তা তো থেকেই যাচ্ছে। এই সুদক্ষ প্রশাসক ও মহান শিক্ষিকার চাকরির কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই অসাধারণ মহিলার সমস্যা তিনি নিজেই। নৈতিক অধঃপতনের জন্যই যদি তার একটা চাকরি যায় তবে অধঃপতি তিনি আবার অন্য চাকরিতে যাবেন কেন? কমলা সেনের জীবনদর্শন, যা-ই হোক তা বেশ কঠোর। অধরের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেমনই হোক, আমাদের শ্রদ্ধা তিনি অকারণে পাননি।

আজ বড় কোমল আলোর দিন। তারের বাজনার মতো বেজে চলেছে পাখিদের আবহসংগীত। দিনটা বড় লাবণ্যময়, বড় গভীর। পৃথিবীর পাত্রটি বুঝি উপচে পড়ছে অধরা মাধুরীতে আজ। এটা কাজের দিন নয়। এইসব দিন আসে মানুষকে খেয়ালখুশিতে পাগল করতে মাঝে মাঝে।

আমি খুব সন্তর্পণে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আমাকে কিছু বলুন। শুতে ইচ্ছে করছে।

কমলা হাসলেন। মাস্টারির নির্মোক খসে যাওয়ায় ভিতরকার লাজুক ও অপ্রতিভ এক কমলা সেন আজ জাদুবলে বেরিয়ে এসেছেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, বলতেই আসা।

বেলা বাড়ছে। কাজের লোকেরা ভিড় করে আসবে। ঘরটা হয়ে যাবে হট্টমালার দেশ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তা হলে বাগানে যাই।

কমলা চোখ না তুলে মাথা নাড়লেন, চলুন।

বাগানের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণে অবস্থিত কুঞ্জবনটি এই বর্ষার জলে, আরও ঘন হয়েছে। লতানে গাছ কেঁপে উঠেছে চারদিকে। ভিতরে নিবিড় ছায়া। আমরা দুজন বসি, মাঝখানে

অনেকখানি ফাঁক রেখে। মৌমাছির গুনগুন আনাগোনা চারদিকে। দোলনচাঁপার গন্ধে বাতাস ভারী।

কমলা একটু সময় নিলেন। আমি অপেক্ষা করলাম।

উনি মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকেই বলা যায়। বলব?

অপেক্ষা করছি।

আমি বহুদিন আগে মরে গেছি। সেই কিশোরীবেলায়। আজকের ঘটনা তো নয়। তখন দুই বেণী বেঁধে স্কুলে যাই, ফ্রক পরি। অধর কী সুন্দর সাইকেল চালাত আপনি জানেন না। এ উইজার্ড অন এ সাইকেল। তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে যেতে পারত। সাইকেলে চেপে সেটাকে স্থির দাঁড় করিয়ে রাখতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চমৎকার ছিল তার বন্দুকের টিপা খুব শরীরী ছিল অধর। চমৎকার গড়ন। উদাত্ত গলায় গান গাইতে পারত। কোন কিশোরীই না তার জন্য? এসব সেই সময়কার কথা। বিয়ে হয়নি, সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কিন্তু রেশটা রয়ে গেল কেন তা বুঝি না। অভ্যাসই হবে। মেয়েরা সহজে সম্পর্ক ভাঙতে পারে না।

আমি এসব বুঝি কমলা। আমি ছাড়া কে বুঝবে?

কমলা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। লৌহমানবীরও বুঝি স্পর্শকাতর কোনও জায়গা থাকে। আঁচলটা তুলে রেখেছিলেন মুখের কাছে আগে থেকেই। বুঝি জানতেন, আজ তার কান্না আসবে।

কিন্তু আর সকলের মতো তো তার কাঁদতে নেই। খুব আলগোছে চোখটা একটু ঢাকলেন আঁচলে। সরিয়ে নিলেন। সামান্য ভারী গলায় বললেন, সবাই জানত, কিন্তু বুঝত না। বিয়ে করলাম না বলে বাড়িতে কত অশান্তি পোয়াতে হয়েছে। মেয়েদের যে কত কিছুর

জন্য দাম দিতে হয়, কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা পুরুষেরা বোঝে না। মেয়েরা হয়তো বোঝে। কিন্তু তারা গা করে না।

যার জন্য এত ভোগান্তি সে বোঝে?

কমলা চমৎকার করে হাসলেন। শিশুর মতো। আগে এমন হাসতেন না। মাথা নেড়ে বললেন, না।

আমি ধীরে ধীরে স্বভাববিরুদ্ধ স্মৃতিভারে আক্রান্ত হচ্ছিলাম। স্মৃতি বড় ভারী। বড় মন্থর করে দেয় মানুষের গতি। কিন্তু স্মৃতি কীসের? আমার জীবনে তেমন কোনও প্রেম নেই, হৃদয়দৌর্বল, নেই। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি, পিছনটা এক রৌদ্রতপ্ত খাখা বালিয়াড়ি। সেই বালিয়াড়ি ভেঙে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক পাগল ঘোড়সওয়ার। তাকে একটা সীমারেখা ডিঙোতেই হবে। দারিদ্র্যসীমা। নারীপ্রেম নেই, স্নেহ নেই, অবকাশ নেই। তার স্ত্রী ছিল সুন্দরী। তার স্ত্রী ছিল প্রণয়ভিক্ষু। তার তখন সময় ছিল না। স্ত্রী অপেক্ষা করতে পারত আর একটু। করল না। চলে গেল। ঘোড়সওয়ার তার দারিদ্র্যসীমা ডিঙিয়েছে শেষ অবধি। সে জানে, সেইটেই আসল কথা।

আমি অনুচ্চ স্বগতোক্তির মতো বলি, স্কুল ছাড়া আপনি আর কোনও কিছুর কথাই ভাবেননি বহু বছর ধরে। শুধু স্কুল আর স্কুল। স্কুলটাই সর্বস্ব ছিল আপনার। আমি আপনার সেই সর্বষই কি কেড়ে নিচ্ছি।

কমলার ঘাড় নোয়ানো, ঘড়ির স্ট্র্যাপ নিয়ে খেলা করতে করতে মৃদু একটু হাসলেন। জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, এবার অন্য দিকগুলোয় মন দিতে পারবেন।

কমলা আমার দিকে একটু তাকালেন, পট করে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, ঠিক জানেন, পারব?

পারবেন না?

কমলা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, কী জানি! মনে হয় না। আমার সবদিকই হারিয়ে গেছে।

বহুদিন। আমি বহুদিন ধরে লক্ষ করছি এক অসম লড়াই। একদিকে স্কুল, অন্যদিকে অধর। একজন বিবাহিত প্রায়-মধ্যবয়স্ক পুরুষ, যে আর সাইকেলের জাদু দেখায় না, কিংবা দেখালেও তাতে আর কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে একটা বিশাল স্কুল, যা গড়ে উঠছে, গড়ে তুলছে। প্রাণবন্ত, স্পন্দনশীল। অধরের কিছু দেওয়ার নেই আর। কিন্তু স্কুল অসংখ্য কচি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে কমলাকে। ব্যগ্র, আকুল হাত। অধর পারবে কেন? কমলার মনের মধ্যে কবেই তো মরে গেছে সে। তবু তার একটা প্রেতচ্ছায়া আছে। সেটাকেই সে বলে ভুল হয় বারবার। আমি জানতাম।

কমলা নতমুখে হাসলেন। কেন হাসছেন? এ তো হাসির সময় নয়!

কমলা আচমকা মুখ তুললেন। স্পষ্ট ও সহজ ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে। মুখে এখনও স্মিত ভাব। বললেন, স্কুলের হিসেবে অনেক কারচুপি ধরা পড়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম, জানি।

কমলা আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, স্কুলের মেন্টেনেন্সের জন্য আমরা কনট্রাক্ট দিয়েছিলাম অধর বিশ্বাসকে। বহু টাকার কনট্রাক্ট। স্কুলের নতুন দুটো উইং তারই তৈরি। তাকে যেসব পেমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলো ভাউচার নেই। আপনি কখনও আমাকে প্রশ্ন করেননি, ভাউচারগুলো কী হল।

আমি মৃদু হেসে বললাম, না। কারণ আমি জানতাম সেগুলো আপনি সরিয়ে নিয়েছেন। হয়তো অধর আপনাকে সরাতে বলেছে।

হ্যাঁ। মানুষকে যখন নিশিতে পায় তখন সে অনেক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে। আপনার কাছে কি ক্ষমা চাইতে হবে?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। কারণ আমার কাছে প্রত্যেকটা ভাউচারের ফটোকপি আছে। আমি বিপদে পড়তে ভালবাসি না।

স্নিগ্ধ এক দৃষ্টিতে আমাকে অকপটে কমলা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুখে দুষ্টুমির একটু হাসি মেখে নিয়ে বললেন, আমিও জানতাম, আপনাকে বিপদে ফেলা সহজ নয়। আর সেই ভরসাতেই চুরি করেছিলাম।

আমার ভিতরকার সেই আশ্চর্য ক্যালকুলেটরটির কথা ওঁকে বললাম না। সর্বদাই সে হিসেব কষে, সর্বদাই সে টের পায়, সর্বদাই সে দেয় নির্ভুল বিপদসংকেত। কিন্তু সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। স্কুলের কাগজপত্রে যে অদৃশ্য হাত পড়ছে তা অনেক আগেই অসীমা মারফত আমি জানতে পারি। ঘটনাটা আমার ভিতরকার ক্যালকুলেটরকে জানাই এবং প্রশ্ন করি, হাতটা কার হতে পারে বলল তো! ক্যালকুলেটর অল্প সময়েই তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছিল, হাতটা কমলা সেনের। কিন্তু মুশকিল হল, কমলা সেনকে আমি জানি। এই কঠোর প্রশাসন ও নীতিপরায়ণ মহিলার পক্ষে এ কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তবে ওঁর একটি রন্ধ্র আছে। সেই রন্ধ্র দিয়েই লোহার বাসরে মাঝে মাঝে হানা দেয় কালনাগিনী। অধর। পুরো একটা দিন আমি ক্যালকুলেটরে অনেক হিসেব-নিকেশ করি। বারবার প্রশ্ন করতে থাকি ক্যালকুলেটরকে, কী করব? কমলাকে হাতেনাতে ধরব, না কি একটা বিকট গণ্ডগোল পাকিয়ে বসব?

না, আমি ওসব করিনি। বরাবর আমার যুদ্ধ ছিল অন্যরকম। অনেক আধুনিক ও বৈপ্লবিক সেই যুদ্ধাস্ত্র। আমি জানতাম, কমলা সেন নিজের দ্বারা চালিত হয়ে এ কাজ করছেন না। এ কাজ তাকে দিয়ে করাচ্ছে একটা ভূত। একটা প্রেতচ্ছায়া। একটা মৃত প্রেমের স্মৃতি। একদিন কমলা সেন জেগে উঠবেনই। একদিন সচকিত হয়ে তিনি আত্মধিক্কারে বলে

উঠবেন, ছিঃ ছিঃ! এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি অধরকে ঘৃণা করতে শুরু করবেন। এর চেয়ে বড় কাউন্টার-অ্যাটাক আর কী হতে পারে আমার পক্ষে?

তাই আমি শুধু নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য কাগজপত্রগুলির ফোটোকপি গোপনে তৈরি করে রেখেছিলাম মাত্র। মুখে কিছুই বলিনি। আজ কমলা সেনের মুখ দেখে বুঝতে আর কষ্ট নেই তার কৈশোর থেকে বহন করে আনা প্রেমের শবদেহটিতে পচন শুরু হয়েছে। তিনি তা কাধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। স্নান করেছেন। শুদ্ধও হননি কি?

আমার দিকে চেয়ে থাকা কমলা সেনের শেষ হচ্ছে না যেন। চেয়ে থেকেই বললেন, কেউ কথাটা জানবে না, না?

না। জানার দরকার নেই।

কিন্তু লোকে চিরকাল আপনাকে অপবাদ দেবে, এমন একজন ভাল হেডমিসট্রেসকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছেন বলে।

মৃদু হেসে বলি, দিক। লোকে আমার আরও অনেক গুরুতর অন্যায়ের কথা জানে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

কমলা সেন মুখ টিপে হেসে বললেন, অথচ পাবলিকের কাছে আমাকে কত ছোট করে দিতে পারতেন আপনি। করলে আর কেউ আপনাকে দায়ী করত না।

আপনি ছোট নন।

কমলা সেন আবার হাসলেন। ভারী শিশুর মতো হাসছেন আজ। শিশুর মতোই সরলভাবে চেয়ে থাকছেন। মৃদুস্বরে বললেন, তাই বুঝি?

আমি একটু আনমনা হয়ে যাই। আমার অস্ত্র শুধু কমলাকে আঘাত করেই যে ক্ষান্ত হয়েছে এমন নয়। অস্ত্রটি হয়তো এখনও ক্রিয়াশীল এবং হয়তো একদিন তা আমাকে লক্ষ্য

করেই ছুটে আসবে। অধর যেমন কমলাকে কাজে লাগিয়েছিল, তেমনি কাউন্টার-অ্যাটাকে আমার দাবার ঘুটি ছিল অসীমা। জাগ্রতবিবেক কমলা যেমন করে ঘৃণা করছেন অধরকে, তেমনি একদিন অসীমাও কি করবে না আমাকে?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি ছোট হলে আমিও হোট। কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবতে নেই।

কমলা ধীরে ধীরে উঠলেন। বললেন, চলুন চিঠিটা আপনার হাতে তুলে দিই।

চলুন–আমিও উঠলাম।

আমরা ঘরে ফিরে আসি। টাইপিস্ট ছেলেটা এসে গেছে। বাইরের বেঞ্চে এসে বসে আছে নানা অর্থপ্রার্থী। কোমল আলোর লাবণ্য মুছে গেছে ঘর থেকে। পাখিদের সেই নিঝরিণীর মতো কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না আর। শুরু হয়ে গেছে কাজের দিন।

কমলা চেনটা খুলে ব্যাগ থেকে খামে আঁটা চিঠিটা বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আসি তাহলে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

রিকশাটা দাঁড়িয়েই ছিল। কমলা লঘু, ভারহীন পায়ে গিয়ে উঠে বসলেন। মুখে সেই স্মিত ভাবটুকু শেষ মুহূর্ত অবধি লক্ষ করলাম। মনে হল, কমলা এখন সত্যিই ভারহীন। এখন তিনি স্কুলের বাচ্চা এক ছাত্রীর মতোই হঠাৎ হাফছুটি পেয়ে অবাক আনন্দে ভরে আছেন।

রিকশা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি মহৎ বা আমি সৎ এমন কথা আমি বলছি না। কারণ আমি তা নইও। দারিদ্র্যসীমা পার হওয়া যে শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার ওপর নির্ভর করে না তা অভিজ্ঞ মাত্রই জানেন। তবু লোকে আমাকে যতটা অসৎ বা অমহৎ বলে জানে আমি বোধহয় ততটা নই। আমি আমার স্ত্রীর হত্যাকারী বলে গণ-দরবার রায় দিয়েই রেখেছে। হায়,

তাদের ফাঁসি দেওয়ার অধিকার নেই। ফলে আমার নিষ্ঠুরতার কথা কেই বা না জানে! অন্যের কথা বাদই দিলাম, কেউ যদি আমার বোন রুমাকে জিজ্ঞেস করে আমি অর্থাৎ তার দাদা আমার স্ত্রী অর্থাৎ তার বউদিকে বিষ দিয়ে মেরেছি কি না তা হলে সে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে না কথাটা বলতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে একটা দ্বিধা বা সন্দেহ তারও আছে।

এইসব অখ্যাতি ও কিংবদন্তী মানুষের অদৃশ্য শত্রু। এদের বিরুদ্ধে লড়াই চলে না। আমি সেই বৃথা যুদ্ধ কখনও করিনি। বরং একটা কিংবদন্তী গড়ে উঠতে দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যা কিংবদন্তী নয়, যা বহু মানুষের চোখের সামনে নিত্য ধীরে ধীরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কেউ কোনওদিন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। বেশিরভাগ মানুষই যদি বোকা ও কিয়ৎ পরিমাণে অন্ধ না হত তা হলে তারা আমার ও কমলার সম্পর্কে একটা মুখরোচক কাহিনি রটনা করতে পারত। সেটা মিথ্যেও হত না।

কিন্তু তারা তা করেনি।

আমি সারাদিন আজ জনসাধারণের বিচিত্র মানসিকতা নিয়ে ভাবলাম। তাদের সকলের চোখের সামনেই তো ঘটেছিল সবকিছু। একটা স্কুলকে গড়ে তোলার জন্য কমলা প্রাণপাত করছিলেন। আমি তার কাছাকাছিই ছিলাম। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তেন, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, রেগে যেতেন। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রী বেশি হত না। রেজাল্ট ছিল খারাপ। অর্থকরী অবস্থা বিপন্ন। নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত ছিল না। সব ধীরে ধীরে অতি কষ্টে হল। আমি তত পুরনো সেক্রেটারি নই। মাত্র শেষ তিনটে টার্মে আমি কমলার কাছাকাছি আসতে পারি। কো-এডুকেশন আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু কমলা জেদ ধরলেন, শুধু গার্লস স্কুলে ছাত্রী হয় না তেমন। বিশেষ করে একটা সরকারি গার্লস স্কুল যখন শহরে রয়েছে। ওঁর জেদ জয়ী হল। আমি হারলাম। এইসব নানা তুচ্ছ জয়-পরাজয় আমাদের মধ্যে তৃতীয় আর একটা সম্পর্কের দরজা খুলে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। কমলা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, ধমক দিয়েই বলতেন, টাকা দিন। ধার নয়, ডোনেশন। আমি দিতাম। কমলা একদিন বলেছিলেন, শুনুন পারিজাতবাবু, কেবলমাত্র টাকা আছে বলেই আপনি

স্কুলের সেক্রেটারি হতে পেরেছেন, আর কোনও গুণে নয়। আমি মৃদু হেসে কথাটা মেনে নিয়েছিলাম। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ সব ঘটনা। তবু জানি, আর কেউ নয়, একমাত্র আমার কাছেই তিনি স্কুলের জন্য নিঃসংকোচে হাত পাততে পারতেন। সেই হাত আমি কখনও শূন্য ফেরাতে পারিনি। না, এর বেশি কিছু নয়। তবু এর চেয়ে গভীর আর কীই বা হতে পারে? কমলার মনের মধ্যে অধরকে আমি তো কবেই হত্যা করেছি। কিন্তু কেউ বোঝেনি। বোধহয় অধর নিজেও নয়।

কদিন হল বৃষ্টি নেই। শুকনো খটখটে দিন। অ্যাকটিং হেডমিসট্রেস হিসেবে দুটো ব্যস্ত দিন কাটিয়ে অবশেষে এক বিকেলে অসীমা এল। আরও জীর্ণ, আরও শীর্ণ, মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের ছাপ।

আমার দিকে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, রোজ স্কুলে কারা গোলমাল করতে আসে বলল তো!

ঘটনাটা আমিও জানি। তবু নির্বিকার মুখে বললাম, কীসের গোলমাল?

স্কুলের সারা দেওয়ালে পোস্টার। ব্রিং ব্যাক কমলা সেন, অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো, পারিজাতের মুণ্ডু চাই, এইসব। স্কুলে দুদিনই ঢিল পড়েছে। শ্লোগান দিয়েছে কিছু লোক। শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকও হবে।

আর স্কুলের ভিতরে কী হচ্ছে অসীমা?

অসীমা একটা শুকনো ঢোঁক গিলল। গভীর এক হতাশা মাখানো মুখে বলল, স্কুলের ভিতর? ভীষণ থমথমে। কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলে না। টিচার্স রুমে খুব উত্তেজিত আলোচনা চলে সারাদিন।

তুমি ভয় পাচ্ছ না তো অসীমা?

ভয়?–অসীমা অনিশ্চয় মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, একটা ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি পারব না।

কেন পারবে না অসীমা? একটা স্কুল চালানো কি খুব শক্ত?

অসীমা আজ চোখের পলক ফেলছে খুবই কম। আমার দিকে সেই চোখে আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এটা যেন কমলাদিরই স্কুল। আমাকে তো কেউ চাইছে না। এরকম সিচুয়েশনে কি কাজ করা যায় বলো!

আমি তো আছি।

অসীমা ওপর নীচে মাথা নেড়ে চিন্তিতভাবে বলল, হ্যাঁ, তুমি আছ। সেটা অবশ্য ঠিক।

কিন্তু আমি আছি জেনেও অসীমার চোখ মুখ বিন্দুমাত্র উজ্জ্বল হল না। একটুও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল না সে। আজ যেন ও সেই বাড়ি, যার বাথরুমের আলোটাও নিভে গেছে। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমার অসীমাকে একবার বলতে ইচ্ছে হল, বিপদের ভয় তোমার কতটুকু অসীমা? স্কুলে পোস্টার দেখোনি? পারিজাতের মুন্ডু চাই! কই একবারও আমার বিপদের কথা বললে না তো!

একটা নির্জন উপত্যকায় দুজন অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দেখা হবে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, লগ্ন আসন্ন। আর বড় একটা দেরি নেই।

অসীমাকে আমি ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে অনেকক্ষণ অন্ধকার কুঞ্জবনে বসে রইলাম চুপ করে। কুঞ্জে কোনও রাধা আসবে না। চিরকাল অপেক্ষা করলেও না। তার বদলে ঝাক বেঁধে এল মশা। কিন্তু আজ তাদের হুল আমি তেমন টের পেলাম না।

# ৮. অভিজিৎ

বুড়ো মানুষদের সঙ্গে থাকার একটা দোষ হল, কখন তাদের কী হয় তা নিয়ে ভাবনা থাকে।

সকালবেলায় দেখি, দাদুর মশারি গোটানো। কেমন কেতরে শুয়ে আছে। মাথাটা পড়ে গেছে। বালিশ থেকে। মুখটা হাঁ-করা। একটা মাছিও ভনভন করছে মুখের সামনে।

পরিষ্কার ডেথ-সিন। সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন। স্ট্রোক। মৃত্যু।

পরের দৃশ্যগুলো পরপর ভেসে যাচ্ছিল চোখের সামনে। লোক ডাকো। কাঁদো, যদি সম্ভব হয়। কাধ দাও, পোড়াও।

ডাকলাম, দাদু! দাদু!

পট করে চোখ মেললেন, কী ব্যাপার?

শুয়ে আছেন যে বেলা অবধি?

ও–বলে উঠে বসলেন। কোমরের আলগা কষিটা ঠিক করতে করতে বললেন, আজকাল এটা হয়েছে। মাঝে মাঝে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে ভাল ঘুম হয় না তো! কাজের মেয়েটা আসেনি?

না।

তা হলে আজ হরিমটর। রাঁধবে কে?

আমার বুকটা এখনও ধুক ধুক করছে। বললাম, দরকার হলে আমি রাঁধব। চিন্তার কিছু নেই।

তুমি রাঁধবে? তুমি রাঁধবে কেন? ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে না?

না। স্কুল এগারোটায় বসে।

দাদু প্রগাঢ় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কাল অনেক রাত অবধি আমার ঘুম হয়নি। তোমার নতুন কেনা হ্যারিকেনটায় খুব আলো হয়। চোখে লাগছিল। অভ্যেস নেই কিনা, অত আলো সহ্য হয় না।

বললেন না কেন, নিবিয়ে দিতাম।

তা কেন, পড়াশুনো করছিলে বোধহয়। নতুন চাকরি, তার ওপর মাস্টারি, একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকারও। তাই কিছু বলিনি।

আমি বললাম, দু ঘরের মাঝখানের দরজাটায় কপাট নেই। থাকলে লাগিয়ে দিতাম।

কপাট দুটো ঘুণে ধরে পচে গেল। আমি আর লাগাইনি। কী দরকার? ও ঘরটায় তো কেউ থাকে না।

এখন আমি থাকব। কপাট আমিই লাগিয়ে নেবখন।

দাদু মাথা নেড়ে বলেন, তারও দরকার নেই। তুমি থাকবে, আমিই হয়তো থাকব না। কপাট দিয়ে তখন কী করবে?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। আমি আর কী বলব?

দাদু বললেন, সাইকেলও তত বোধহয় একটা নো দরকার। গণেশেরটা বোধহয় আর বেশিদিন দেবে না, না?

চাইলে দেবে, কিন্তু তার দরকার কী? কিনেই ফেলব একটা।

নতুন চাকরি। টাকা পয়সা হাতে আসতে না আসতেই মোটা খরচ। সামলাতে পারবে?

হয়ে যাবে কোনওরকম।

মা-বাবাকেও কিছু পাঠাতে হবে তো।

ও নিয়ে ভাববেন না।বলে আমি রান্নাবান্নার জন্য রওনা হচ্ছিলাম।

দাদু বললেন, এক কাজ করো। আমার তেমন খিদে নেই। আজ বোধহয় একাদশীও। ছোট পঞ্জিকাটা দেখো তো।

আমি দেখলাম। একাদশীই।

দাদু বললেন, তা হলে এ বেলা গণেশের বাড়িতেই খেয়ে স্কুলে রওনা হয়ে যাও। প্রথম প্রথম পাচুয়াল হওয়া ভাল। দেরি হলে কে কী বলবে।

রোজ ওদের বাসায় যাচ্ছি।

আদর করেই তো খাওয়ায়।

তা অবশ্য করে। তবু রোজ খাওয়া ভাল নয়।

রোজ না হয় নাই খেলে, আজকের দিনটা চালিয়ে দাও। কাল কাজের মেয়েটাও এসে যাবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, মেয়েটা কি এমনি কামাই মাঝে মাঝে করে?

করে। তা আমার অসুবিধে হয় না। চালিয়ে নিই। অসুবিধে তোমাদের।

তাই দেখছি।

যতটা বীরত্বের সঙ্গে রান্না করতে রাজি হয়েছিলাম, কাঠের উনুন ধরাতে গিয়ে তা ফানটুস হয়ে গেল। স্টোভ এ বাড়িতে নেই, দাদু তা কিনবেনও না। বাড়িতে শুকনো ডালপালা, পাতানাতার অভাব নেই। এসব ইন্ধন থাকতে পয়সা দিয়ে জ্বালানি কেনে কোন আহাম্মক!

মোটামুটি একটা ডাল ভাত নামাতেই আমার দম বেরিয়ে গেল, স্কুলেরও বেলা প্রায় যায় যায়।

দাদু দূর থেকে সবই লক্ষ করছেন। আমি খেতে বসার পর বললেন, আজ পারলে বটে, কিন্তু রোজ পারবে না। কাজের মেয়েটা আজকাল ঘরের কাজ করতে চায় না। ঠিকাদারের মজুর খাটলে অনেক বেশি পায়। কাজের লোকের খুব অভাব।

আমি গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললাম, কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে ঝি চাকর বলে কেউ থাকে না। উন্নত দেশগুলিতেও নেই।

তাই নাকি?–দাদু চিন্তিতভাবে বললেন।

আমি বললাম, ভাববেন না। দুদিনে এসব অভ্যাস হয়ে যাবে। কাল আমি একটা স্টোভ কিনে আনব।

স্টোভ!-দাদু চোখ কপালে তুললেন, আবার স্টোভ কেন?

ভয় পাবেন না। রোজ জ্বালাব না, যেদিন কাজের মেয়ে আসবে না, শুধু সেদিন।

খুব খরচের হাত তোমার। এটা ভাল নয়।

যা দরকার তা তো কিনতেই হবে।

তা বলে একসঙ্গে এত! এই তো হ্যারিকেন কিনলে, সাইকেলও কিনবে বলছ, আবার স্টোভ!

খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বললাম, আপনার আজ খেতে কষ্ট হবে। শুধু ডাল ভাত আর সেদ্ধ।

যথেষ্ট। আমি তো শুধু সেদ্ধ দিয়ে খাই। আজ তবু ডাল হয়েছে।

আমি গণেশকাকার কাছ থেকে ধার করে আনা সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশি সময় নেই।

নতুন চাকরির একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। নিতান্তই মাস্টারি যদিও। তবু এই প্রথম নিজেকে খানিকটা মূল্য দেওয়া যাচ্ছে। একেবারে ফালতু, পরনির্ভরশীল, শিকড়হীন তো আর নই। কিছু একটা করছি, কাজে লাগছি।

আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী তা আমি জানি। শিষ্ট আমি নই, শান্তও নই। কোনওকিছুই আমি সহজে মেনে নিইনা। শিবপ্রসাদ স্কুলে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি, এই স্কুলে গভীর গণ্ডগোল আছে। ধীরে ধীরে সেগুলি আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তারপর জোট বাঁধা। পারিজাত জানে না, কী একখানা টাইমোমা যে শিবপ্রসাদ স্কুলে স্থাপন করেছে। এর জন্য তাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে।

আমি যেদিন প্রথম স্কুলে জয়েন করি সেদিন কিছু লোক এসে বাইরে থেকে খুব শ্লোগান দিল। কমলা সেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ করো। অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো। পারিজাতের মুণ্ডু চাই।

সবাই বারণ করা সত্ত্বেও আমি ফটকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাদের লক্ষ করলাম। এরা কারা তা বুঝলাম না। তবে মনে হল এরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়। ভাড়াটে লোক হওয়াই সম্ভব।

তিনদিন বাদে স্ট্রাইক হয়ে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগের প্রতিবাদে।

গণ্ডগোলের আঁচটা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছি। বলতে কী, গণ্ডগোলের জায়গাই আমার প্রিয়। এই আমার স্বক্ষেত্র, এই আমার ইনসেনটিভ।

একদিন অসীমাদি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার ঘরে।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে কাজ করতে?

ভালই।-নিস্পৃহ গলায় বললাম। আমার চাকরি হওয়ার পিছনে ওঁর একটু হাত আছে। কিন্তু তা বলে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হওয়ারও মানে হয় না। স্কুলের হেডমাস্টার বা হেডমিসট্রেসের পদটিই একটি কায়েমি স্বার্থের সুযোগ। ভবিষ্যতে হয়তো ওঁর বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। মনটাকে বেশি কৃতজ্ঞতার মাখন মাখিয়ে রাখলে অনেক ফ্যাচাং।

উনি অবশ্য আমার মুখভাব তেমন করে লক্ষ করলেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক, বিপন্ন মুখভাব। হতেই পারে। কমলা সেন নাকি খুব ভাল অ্যাডমিনস্ট্রেটর ছিলেন। তাকে হটিয়ে ইনি এসেছেন। আর এই রদবদলের মূলে আছে পারিজাত। টিচার্সরুমে বসে প্রায় সারাদিনই এসব কথা হয়। কাজেই সাবধান হওয়া ভাল। লোকে যাতে ধরে না নেয় যে, আমি অসীমা বা পারিজাতের লোক। আমি তা নইও।

অসীমা দিদিমণি আমার দিকে আনমনে চেয়ে বললেন, স্কুলে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই না? এর মধ্যে এসে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে!

না। গণ্ডগোল হতেই পারে।

অসীমাদি একটু চুপ করে চেয়ে থেকে বললেন, আমার ভাল লাগে না। স্কুলটা চিরকাল শান্ত ছিল। কোনও গণ্ডগোল ছিল না। এখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক এসে বিশ্রী শ্লোগান দেয়, ঢিল ছেড়ে। ছেলেমেয়েরা ভয় পায়।

আমি দোনোমোনো করে বলি, ওই লোকগুলো কারা তা আপনি জানেন?

কারা আর হবে? পাবলিক।

আমার সন্দেহ থেকে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগ যদি অবৈধ বা অন্যায় কিছু হয়ে থাকে তবে আইন-আদালত আছে। আর পাবলিকের আন্দোলন ঠিক এরকম প্রকৃতির হয় না। বেশিরভাগ স্কুলেই এরকম কিছু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকে। তাতে বাইরে থেকে রোজ ঢিল পড়ার কারণ নেই। আন্দোলন আমি কিছু কম করিনি।

পরদিন লোকগুলো আবার এল। আমি এবার ফটক খুলে বেরিয়ে সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনা ত্রিশেক লোক। আমাকে মুখোমুখি দেখে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করতে যাইনি। তবে হাতজোড় করে বললাম, আমাকে কিছু বলতে দিন।

লোকগুলো সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করল না। আমি স্কুলের সামনে একটা কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে স্ট্রিট কর্ণার করা অভ্যস্ত গলায় আধঘণ্টা ধরে একটা চোস্ত ভাষণ দিলাম। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও ছিল।

কাজ হল। দুদিন যাবত তারা আসছে না।

টিচার্স রুমে যারা একদম পাত্তা দিত না তারা এখন কথাটথা বলছে।

স্কুলটা আমার ভালই লাগছে। বেশ বড় স্কুল। হাজার খানেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী, ডিসিপ্লিন চমৎকার। ক্লাস বাগে আনতে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

আজ স্কুল শুরু হওয়ার মুখেই অসীমাদি ডেকে পাঠালেন।

পারিজাত আপনাকে একটু ডেকে পাঠিয়েছে। জরুরি দরকার।

আমাকে!–আমি একটু ভ্রু কোচকাই। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না।

সেক্রেটারির বাড়িতে গেলে এখন ঘটনাটা অন্যরকম দেখাবে। কিন্তু ডাকলে যেতেই হয়। বললাম, কখন?

আজই। খুব দরকার বলছিল।

অগত্যা।

পারিজাত আজও জরুরি মিটিং করছিল। সুতরাং আমাকে উমেদারের মতোই অপেক্ষা করতে হল বাইরে। আমি আগের দিনের মতোই একটা কুঞ্জবনে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। আজ অবশ্য রুমা নেই। একা আমি।

একটু বাদেই দারোয়ান এসে ডেকে নিয়ে গেল।

পারিজাত একটু ভোম হয়ে আছে। খুব মানসিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে মানুষের মুখেচোখে যেন একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তবে আমাকে দেখে ছুরির ফলার মতো ঝিকিয়ে উঠল তার হাসি, এই যে হিরো, এসো, এসো। বোসো।

আমি বসতে বসতে বললাম, হিরো কীসের?

শুনলাম, অধরের ভাড়াটে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ! সত্যি নাকি?

কার ভাড়াটে লোক?

একজন নমস্য ব্যক্তির। অধর বিশ্বাস।

আমার ভিতরে একটু টিকটিক আওয়াজ হল। অধর বিশ্বাস। সেই সাইক্লিস্ট! মস্তান!

বললাম, ঠিক জানেন?

পারিজাত হাসল। বলল, জানি। কিন্তু এর বেশি হিরো হতে যেয়ো না। বিপদে পড়বে।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, জামার কলারটা একটু তুলে দিই। তার বদলে খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একটু হাসলাম। প্রথাসিদ্ধ মস্তানদের দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে। এক সময়ে খুদে খুদে নকশাল ছেলেদের ভয়ে তাদের আমি প্রাণভয়ে পালাতে দেখেছি।

পারিজাত আমার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই আমার ভিতরটা দেখে নিয়ে বলল, তুমি অবশ্য নকশাল ছিলে। ভয়ডর কিছু কম। তাই না?

আমি গোমড়া মুখ করে রইলাম।

পারিজাত খুব আস্তে করে বলল, নিমকহারাম।

আমি ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠে বলি, কী বললেন?

নিমকহারাম।

তার মানে?

লজ্জা করে না?

কী বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।

হৃদয়হীন। অকৃতজ্ঞ।

আমি চটে উঠে বলি, খামোখা গালমন্দ করছেন কেন?

করা উচিত বলে।

আমি কী করেছি?

এই ঘোরতর বেকার সমস্যার যুগে তুমি একটা ভদ্র চাকরি পেয়েছ।

তাতে কী হল?

চাকরিটা পেয়েছ আর একজনের বদান্যতায়।

সে আবার কে?

যাক, অকৃতজ্ঞতা তাহলে ডিপ রুটেড! এর মধ্যে তাকে ভুলতেও শুরু করেছ! অ্যাঁ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই নোকটার অদ্ভুত আচরণে। কিন্তু তেজের গলায় বলি, আমি কারও বদান্যতার ধার ধারি না।

ধারো না, তার কারণ তুমি জেনুইন অকৃতজ্ঞ।

আমি অকৃতজ্ঞ নই।

পারিজাত চট করে তার টেম্পোটাকে একটু নামিয়ে এনে বলে, নও?

না।

তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো? জনগণকে?

এ প্রশ্ন অবান্তর।

পারিজাতের দুটো চোখ চিকচিক করতে থাকে। বলে, যারা শ্রেণিশত্রু নয় তাদের কথা বলছি। তাদের ভালবাসতে তো অসুবিধে নেই?

আমি আপনার কথা ধরতে পারছি না।

ধরার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিয়ে যাও না।

আপনি আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চান বলে মনে হচ্ছে।

বুদ্ধি তো বেশ টনটনে দেখছি।

আমি নির্বোধ নই, আপনিও জানেন।

জানি, হাড়ে হাড়ে জানি। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় তুমি তিন-তিনজন কঠোর মহিলার স্ট্রং রেকমেনডেশন জোগাড় করে ফেলেছিলে।

ও কথা থাক। কাজের কথায় আসুন।

আমি কাজের কথাই বলছি। তুমি জনগণ এবং সর্বহারাদের ভালবাসো কি না।

হয়তো বাসি।

তুমি একটা চাকরি পেয়েছ কি না।

পেয়েছি।

তা হলে?

তা হলে কী?

জনগণের প্রতি তোমার কোনও কর্তব্য আছে কি না।

সব সময়েই আছে।

পারিজাত একটু ঝুঁকে বসে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে থেকে বলে, জনগণের মধ্যে বিশেষ একজন তোমার জন্য অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করেছিল। প্রায় আত্মোৎসর্গ। মনে পড়ে?

সে কে?

তাকে ভুলে যাওয়াটা অপরাধ অভিজিৎ।

আমি বিরক্ত মুখে বলি, আপনি কি প্রতিমার কথা বলছেন?

পারিজাত একটা শ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দেয়। মৃদু স্বরে বলে, যাক। নামটা অন্তত মনে আছে।

প্রতিমার কী হয়েছে?–আমি জিজ্ঞেস করি।

কী হবে? একজন নিম্ন-মধ্যবিত্তের যুবতী মেয়েদের জীবনে কী আর হয়? কিছুই হয় না। তারা বসে থাকে। অপেক্ষা করে। চাকরি বা বিয়ে কিছু একটা আশা করতে থাকে। শেষ অবধি হয়তো কোনওদিনই হয় না। তুমি কি জানো, বেকার সমস্যার মতো এইসব অনূঢ়া কন্যাদেরও একটা বিশাল সমস্যা রয়েছে এ দেশে?

জানব না কেন? আমারও দুটো বোনের বিয়ে বাকি।

তুমি জানো যে, বেকার সমস্যা এবং অনুঢ়া সমস্যা দুটোই কো-রিলেটেড?

তাই নাকি?

ন্যাকামো কোরো না অভিজিৎ। বুদ্ধিমান ছেলেদের এটা জানার কথা যে, দেশে এত বেকার না থাকলে মেয়েদের বরের অভাব হত না।

তা বটে।

তুমি কি জানো, উপযুক্ত পাত্রদের সংখ্যা কম বলেই দেশে একটা দুষ্ট পণপ্রথা ক্রমেই প্রসারলাভ করছে? এবং বেকার সমস্যা, বিয়ে ও পণপ্রথা এই তিনটেই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? জানো?

বোধহয়।

তা হলে?

তা হলে কী?

এখন চাকরি পাওয়ার পর তোমার কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি। লোকটা বাস্তবিকই পাজির পা-ঝাড়া। তবু একে আমি ঘেন্না করতে পারছি না, এর ওপর রেগে উঠতে পারছি না। হঠাৎ হেসে ফেলে বললাম, কিছু কর্তব্য করতে হবে নাকি কারও প্রতি?

দায়িত্বশীলদের তো সেটাই মোটো হওয়া উচিত। তুমি নিজে উঠে গেছ, এবার আর একজনকেও টেনে তোলো।

কী করতে হবে?

ভেবে দেখো। আমি ফোর্স করতে চাই না।

ফোর্স করলেও লাভ নেই। কেউ ফোর্স করে কখনও আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারেনি।

পারিজাত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, মডার্ন ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই বলে ওকথা বলছ। এ যুগে বুদ্ধিমান লোকেরা ফোর্স কীভাবে অ্যাপ্লাই করে জানো?

খানিকটা জানি!

কিছুই জানো না। তোমাকে কখনও সেই যুদ্ধে নামতে হয়নি।

আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

দেখাচ্ছি। কিন্তু লক্ষ করছি, তুমি ভয় পাচ্ছ না।

আমি হেসে ফেলি, বলি, না, পাচ্ছি না।

তা হলে আমাকে স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হয়।

কীরকম?

একবার প্রতিমার সঙ্গে দেখা করে অন্তত একটা হ্যালো বলে এসো। এটুকু ওর পাওনা। বেচারা মহৎ হওয়ার জন্য চাকরি থেকে সরে দাঁড়াল অথচ সেই মহত্ত্বটুকু কেউ স্বীকার করল না। এটা নিষ্ঠুরতা অভিজিৎ।

আমি রাগ করে উঠে পড়লাম। বললাম, আর কোনও কথা নেই তো?

সে সব পরে হবে।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সাইকেলে উঠে ঝড়ের বেগে সেটাকে চালাতে লাগলাম। এসব কী হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি। ষড়যন্ত্র! প্ল্যান! ফাঁদে ফেলার চেষ্টা!

আমি মউডুবির দিকে অর্ধেক পথ গিয়েও আচমকা সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিই।

দরজা খুলল প্রতিমা। ম্লানমুখী। কয়েকদিনেই যেন কৃশকায়া। বিষণ্ণ। কিছু বলল না প্রথমে। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ বলল, এতদিন কোথায় ছিলেন?

ফেরার পথে ধীরে ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। খুব ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে আপনমনে একটু করে হেসে উঠছি আমি। কী হল আমার হঠাৎ? কী হল? যাঃ! পাগল, পাগল, দুনিয়াটাই পাগল!

# ৯. পারিজাত

এবার বন্যা হল না। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে অসীমা। অভিজিৎ আজকাল স্কুলের পর রোজ প্রতিমাদের বাড়ি যায়। রুমা আবার বিয়ে করেছে। গন্ধর্বকেই। আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা। ভারী সুন্দর এই ঋতু। যদিও প্রকৃতির দিকে তাকানোর সময় আমার কম। তবু টের পাই। বাইরে শরতের আলো আর ছায়া সাদা ও কালো দুটি শিশুর মতো আপনমনে খেলছে।

হে আমার দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, জীবনের কোনও গল্পেরই কোনও শেষ নেই। একটা ঘটনা থেকে জীবন আর একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে অশেষ হয়ে চলে গল্প। এই বুড়ি পৃথিবী অবিরল বলে যাচ্ছে গল্পের পর গল্প। শেষ নেই। এই গল্পে অর্থহীন জয়, নিরানন্দ পরাজয়, ক্ষণস্থায়ী সফলতা, খণ্ডিত বিফলতা, সূক্ষ্ম প্রেম বা স্থূল বিবাহ ফিরে ফিরে আসে। আমার দারিদ্র্যসীমা পেরিয়ে আসার কিংবদন্তীও পুরনো হয়ে এল। আমি জানি, আমার মতো আরও হাজার হাজার লোক দারিদ্রসীমা ডিঙোবে। রচিত হবে আরও কত কিংবদন্তী। একদিন দারিদ্র্যসীমার রেলবাঁধের ওপাশে আর লোকবসতি থাকবে না। আমরা সেদিন সবাই মিলে তুলে দেব ওই রেলবাঁধ। আমি সেই স্বপ্ন দেখি।

শরতের এই রঙিন বিকেলে আজ কিছু নির্জন অবকাশ পেয়ে গেছি। কিছু উন্মন। আমার ক্যালকুলেটর বারবার সংকেত দিচ্ছে। আমার বাগানে শিউলির গন্ধ। পিছনে এক মরুভূমির মতো অতীত। সামনে এক পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা।

আমি নিরালা কুঞ্জবনে একা বসে আছি। একা! অসীমা আজকাল আসার সময় পায় না।

সময় পায় না? না, কথাটা ঠিক নয়। আমি জানি, অসীমা ভয় পায়। বড় ভয় পায়। ক্যালকুলেটর কারই বা নেই! ভিখিরিরও আছে। কারও কারও ক্যালকুলেটর নির্ভুল,

কারও ভুলে ভরা। অসীমার ক্যালকুলেটর কেমন তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তার যন্ত্রটি নিশ্চিত তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে, ও ভাল নয়, ওর কাছে যেয়ো না। অসীমা হয়তো খুব বেশি আসবে না আর। স্কুল তাকে অজস্র কচি হাতে জড়িয়ে ধরবে। নিয়ে নেবে। নিক।

আমি আজ কিছু ভাবছি না। কুঞ্জবনে অদ্ভুত রূপময় আঁধার। বাইরে পাখি ডাকছে। গুনগুন করছে মৌমাছি। শিউলির মাতাল গন্ধে ভরে আছে দশ দিক।

ফটকের বাইরে আজও চেঁচাচ্ছে সেই মাতাল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোককে শোনাচ্ছে আমার জীবনকাহিনি। রাজার আলমারির মধ্যে আমি কীভাবে পেয়ে যাই গুপ্তধন। কীভাবে গরিবদের শোষণ করে আমি আস্তে আস্তে উঠে গেছি টাকার পাহাড়ের চূড়ায়। আমার শ্বাসবায়ুতে মিশে আছে কত হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস।

আমার খারাপ লাগে না। একভাবে না একভাবে নিজের অজান্তে সে পিটিয়ে চলেছে আমারই ঢাক। গড়ে উঠছে কিংবদন্তী। রহস্য। ইন্দ্রজাল।

ফটকের মধ্যে যে চারজন ছায়ামূর্তি ঢুকল তাদের দেখে আমি চমকালাম না। সহজ, সুঠাম তাদের হাঁটার ভঙ্গি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তাদের শরীর। ক্যালকুলেটর বলল, সাবধান! আমি তাকে চুপ করিয়ে রাখলাম। এরা অধরের লোক। সে নিজে আসেনি। আসতে নেই।

লোকগুলো দারোয়ানকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। বোধহয়, আমি কোথায় জেনে নিল। ঘাসজমিতে তাদের পায়ের কোনও শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু তারা আসছে। তারা ভাল লোক নয়। খুনি, গুন্ডা, নিষ্ঠুর। আমি জানি।

শিউলির দম বন্ধ করা গন্ধ আমি বুক ভরে নিই। আমি জীবনে অনেক লড়াই জিতেছি। এক-আধটা লড়াই হারলে আর তত ক্ষতি হবে না আমার। বরং কিংবদন্তী সৃষ্টি হবে আবার। ঘন হয়ে উঠবে রূপকথা।

পরাজয়ের শেষ সীমানায় দাঁড়ানো অধর জানে না, উপত্যকায় আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তার রক্তে রাঙানো তলোয়ার মুছে আমি খাপে ভরে ফেলেছি। আকাশে এখন শকুন উড়ছে।

আমি একটু হাসলাম। নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে রইলাম আনমনে। শিউলির গন্ধে বুক ভরে উঠছে।

বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ছজন লোক। এদেরও হাঁটার ভঙ্গি সহজ, সুঠাম। চমৎকার চটপটে। ঘাসজমির ওপর ছটা বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চকিত পায়ে লাফিয়ে নেমে এল তারা।

অধরের লোকেরা কুঞ্জবনের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারল না শেষ অবধি। ছজন তাদেরই মতো আত্মবিশ্বাসী নিষ্ঠুর ও জান কবুল লোক তাদের পথ আটকাল।

তারপর যা হয় হচ্ছিল। আমি একটা হাই তুললাম, অধরের পয়সা-খাওয়া চারটে লোকের সঙ্গে আমার বেতনভুক ছজন লোক খুব নিবিষ্ট এক মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঝিকোচ্ছে ছোরা, রিভলভার, নল, ঘুসি, ব্লেড। বড় একঘেয়ে।

দারিদ্রসীমা ডিঙোতে গিয়ে আমার পথে বহুরকম বাধা পড়েছে। এক-আধটা লাশও কি পড়েনি? কিন্তু এসবই অত্যন্ত মোটা দাগের ব্যাপার। আমার ভাল লাগে না।

শিউলির গন্ধ বড় মাতাল করেছে আজ আমাকে। নিমীলিত চক্ষে সামনের দিকে চেয়ে আমি মাতাল হয়েও যাচ্ছি। পিছনের ঘাসজমিতে লড়াইটা বোধহয় শেষ হল, কে হারল, কে জিতল তা জানার জন্য আমি মোটেই উদগ্রীব হই না। তবে জানি শেষ অবধি আমার কাছে কেউই পৌঁছতে পারবে না।

ক্লান্তিতে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজলাম।